বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস ও প্রয়োগ ঃ একটি পর্যালোচনা

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

রেজিঃ নং-৮৮

শিক্ষাবর্ষ- ২০০৯-২০১০

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস ও প্রয়োগ ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমি এই গবেষণা কর্মটি ইতঃপূর্বে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে এম. ফিল. বা পিএইচডি বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য পেশ করিনি। এই গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জনের জন্য পেশ করা হলো।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রেজিঃ নং-৮৮
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৯-২০১০
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ রফিকুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে "বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস ও প্রয়োগ ঃ একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক এম. ফিল. গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এই শিরোনামের গবেষণা কর্মটি আমার জানা মতে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে এম. ফিল. বা পিএইচডি বা উচ্চতর কোন ডিগ্রীর জন্য ইতঃপূর্বে পেশ করা হয়নি।

এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখেছি এবং এম. ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. সালাহউদ্দিন এর নিকট সর্বান্তকরণে ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা এবং আন্তরিক তত্ত্বাবধায়নের ফলে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের দুই পর্বের এম. ফিল. কোর্সের প্রথম পর্ব বিভাগীয় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে হয়। প্রথম পর্বের পাঠ্যসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শন বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যেকের কাছে আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা কলেজের গ্রন্থাগারসহ অনেকের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সংশ্লিষ্টদের সহায়তা ছাড়া গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা সহজ হতো না। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার জন্য যাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম
রেজিঃ নং-৮৮
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৯-২০১০
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৮
প্রথম অধ্যায়	
১.১ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পটভূমি	৯-৪১
১.১.১ মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় বস্তুবাদী দর্শনের সূত্রপাত	
১.১.২ কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ	
১.১.৩ এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ	
১.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঃ একটি সাধারণ আলোচনা	৪১-৪৬
১.৩ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক	৪৭-৫২
১.৪ সমাজ শ্রেণী	৫৩-৭১
১.৫ অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিসৌধ	৭১-৭৪
১.৬ উপরিসৌধঃ রাষ্ট্র, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন	৭৫-৭৯
১.৭ শ্রেণী, শ্রেণী-বিভাজন ও শ্রেণী-সংগ্রাম	৭৯-৯২
১.৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ঃ প্রলেতারিয়েত মিশন	৯২-১০৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.১ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস	১০৯-১২৪
২.২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকা	১২৪-১৩১
২.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন	১৩১-১৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	
৩.১ মুজিববাদ ঃ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে সূচনা	১৩৫-১৪৩
৩.২ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ	১৪৩-১৫১
৩.৩ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের স্তর ও শ্রেণীসমূহের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা দ্বন্দ্ব	১৫১-১৫৩
৩.৪ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে প্রয়োগে সুপারিশসমূহ	১৫৩-১৫৫
উপসংহার	১৫৬-১৬০
গ্রন্থপঞ্জি	১৬১-১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবস্ট্রাক্ট

বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস ও প্রয়োগ ঃ একটি পর্যালোচনা

১. প্রস্তাবনা ঃ মার্ক্সবাদ হলো একটি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক মতবাদ, যা গোটা পৃথিবী ও মানব সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করে। এ আলোচনার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি হলো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, যা প্রচলিত অধিবিদ্যা ও ভাববাদী নিয়মের বিপরীতে অনুষ্ঠিত হয়। মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)-এদের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আমাদের এই পৃথিবীর একটি বস্তুবাদী ইতিহাস তৈরি করা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ পৃথিবী সম্বন্ধে সাধারণ দার্শনিক বক্তব্য প্রদান করে। অন্যদিকে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের আরম্ভ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রদান করে, বিশেষ করে রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করে। এ কথা সত্য যে, মার্ক্সবাদ ইতিহাস, সভ্যতা, সমাজ, সত্য, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করে পৃথিবীতে আলোড়ন তৈরি করেছিল। আর সেই সময় থেকে ঊনিশ শতকে আমাদের এই বাংলাতেও এর প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু মার্ক্সবাদ তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই প্রভাব বিস্তৃতি বিকাশ ইত্যাদি বাংলাদেশে কতটুকু অবদান রেখেছে সেই বিষয়টি একটি দার্শনিক পর্যালোচনার আলোকে এই গবেষণায় তথ্যভিত্তিকভাবে অনুসন্ধান করা হবে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ বস্তুজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েই গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে মানুষ বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন যা কিছু চর্চা করুক না কেন, তার জন্য প্রযোজন হলো অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান। আর অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে হলেই প্রয়োজন অর্থনৈতিক ভিত্তি। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভর করছে মানুষের ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি। এই নির্ভরতা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা নিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস, প্রয়োগ ও প্রতিফলন নিয়ে এ যাবতকালের গবেষণা আলোচনায় আমাদের জানা মতে তেমন সুগঠিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে উঠেনি। এই গবেষণাকর্মে সেই অসমাপ্ত কাজটি তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **গবেষণার পরিধি ঃ** ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পটভূমি, ইতিহাস ও প্রয়োগ সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস ও প্রয়োগের মধ্যে গবেষণা কর্মটি সীমাবদ্ধ।

৪. গবেষণার পদ্ধতি ঃ বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণ।

৫. অভিসন্দর্ভের গঠন পরিকল্পনা ঃ গবেষণার অভিসন্দর্ভে তিনটি অধ্যায় রয়েছে। এই অধ্যায়গুলো হলো ঃ

প্রথম অধ্যায় : ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পটভূমি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা বিশেষ করে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক, সমাজ শ্রেণী, অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিসৌধ, শ্রেণী, শ্রেণী-বিভাজন ও শ্রেণী-সংগ্রাম এবং এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিকভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মুজিববাদ ঃ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে সূচনা, বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ, বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের স্তর ও শ্রেণীসমূহের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা দ্বন্দ্ব এবং বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে প্রয়োগে সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

এ ছাড়া ভূমিকা ও উপসংহার রয়েছে এবং একটি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিত রয়েছে।

৬. **প্রাথমিক উৎস ঃ** মার্ক্স ও এঙ্গলস রচনাবলী।

৭. **দ্বৈতীয়িত উৎস ঃ** প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থসমূহের পাঠ ও তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশিত গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা পাঠ এবং তত্ত্বাবধায়কের শ্রেণী পাঠ-দান ও মতামত গ্রহণ।

৮. **গবেষণার আনুমানিক সময় পরিধি ঃ** দুই থেকে তিন বছর।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত অভিসন্দর্ভের সারাংশ

কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তনের নিয়মাবলি ও চালিকাশক্তিগুলো সম্পর্কে যে সাধারণ মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় প্রথমত বস্তুবাদ একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। তিনি বস্তুবাদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনার পাশাপাশি ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্ক্সীয় ও লেনিনীয় দর্শনের একটি বিশেষ অংশ, যা মানব সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে নতুন নতুন নিয়ম-প্রণালী তৈরি করে। বিশেষ করে মানব সমাজের বিকাশের জন্য তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উদ্ভাবন করেছেন। সমগ্র মানব সমাজ, মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা ও ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করাই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজ জীবনের সামগ্রিক রূপ, সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়ম ও পরিচালিকা শক্তি নিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আলোচনা করে। অর্থাৎ, সামাজিক চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্য এবং সমাজ জীবনে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও গুরুত্বকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়। তাছাড়া সমাজ জীবনে ও সমাজের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারার চিন্তা-চেতনাগুলোর গুরুত্বের উপর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা হলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিতে নিয়োজিত থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ব্যক্তির আচরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো আসে তার পিছনে ভাববাদ বা কোন অলৌকিক ধারণা কাজ করে না। তাঁদের মতে, সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের উৎস হলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন প্রক্রিয়া। মার্ক্স-এর মতে, বাস্তব উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার ক্ষমতার উপর ইতিহাসের ধারণা নির্ভর করে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে জীবনের বস্তুগত উৎপাদন থেকে শুরু করে এবং বিনিময় সম্পর্কের রূপ ও উৎপাদন পদ্ধতির সামগ্রিক উপলব্ধি থেকে বুঝতে হবে। কারণ এই সামগ্রিক উপলব্ধিই হলো সমস্ত ইতিহাসের ভিত্তি। বাস্তব উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্র, চেতনার স্বরূপ, দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদির উদ্ভব ও বিকাশ অনুসন্ধান করতে হয়। তাইতো আত্মসচেতনতাকে আত্মার আত্মা হিসেবে রূপান্তরিত করলেই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে না। বরং ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই একটি বস্তুগত ফলাফল, উৎপাদন-শক্তিগুলোর সমষ্টি, প্রকৃতির সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—যা প্রত্যক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে। অর্থাৎ, উৎপাদন-শক্তি, সঞ্চিত পুঁজি

ও শর্ত — প্রত্যক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে একদিকে নতুন প্রজন্মের রূপান্তর ঘটিয়ে অন্যদিকে জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট বিকাশ ও বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের লক্ষ্যে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ইউরোপ, আমেরিকা ও তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্যের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক বিপ্লবের প্রভাব আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন লেনিন। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তথা কমিউনিজম মতবাদ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' গড়ে তোলেন। ফলে চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম লাভ করে। ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি সার্থক প্রয়োগ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দলীয় নেতৃত্বে সংগঠিত হয় তেভাগা আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, কেরালায় পুন্নাপা ভায়াল আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন ও কায়ুর আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রাশিয়া ও চীনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের মহাবিতর্ক বা দ্বন্দ্বে উপমহাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রয়োগের ক্ষেত্র বাম রাজনীতিতে সর্বাধিক ভাঙন ধরে। বাংলাদেশেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রয়োগের ক্ষেত্র পরিচিত কমিউনিস্ট রাজনীতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বহুদল ও উপদলে বহুধাবিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের লক্ষ্যে এ দেশের কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা নব উদ্যোমে কার্যক্রম পরিচালন করতে থাকেন। ঐতিহাসিক বিপ্লবের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের সূচনা হয় মুজিববাদী দর্শনে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তাচেতনাকে তথা রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ দার্শনিক চিন্তনকে মুজিববাদ বলে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারের নির্যাসই নিয়েই মুজিববাদ। বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্য তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, গণসংগ্রামকে সার্থক করার জন্য, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বিজয়ী করার জন্য এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও সেতুং-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করতে হবে। এই শিক্ষার মূলকথা হলো বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে একই সাধারণ

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যান্য শ্রেণী, পার্টি ও সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম চালানোর প্রচেষ্টা করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী ও কমিউনিস্ট সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রপাত হলেও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বয়স হলো একটি শিশুর সমান। এজন্যই কোন বিচক্ষণ রাজনীতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। এদেশের কোন কমিউনিস্ট পার্টি আজ পর্যন্ত তাদের গঠনতন্ত্র থেকে শুরু করে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। অর্থাৎ, মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির আলোকে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের মার্ক্সবাদী দলগুলো এখন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। আজকে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রায় সামগ্রিকভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং এদের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত হলেও এদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যথার্থ অর্থপূর্ণ হতে পারেনি। কারণ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের জন্য সঠিক নেতৃত্ব, মার্ক্সীয় রাজনীতির সঠিক অনুধাবন ও সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বাস্তব অবস্থা বিরাজমান থাকলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে এদেশে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অপরিণত, অপরিপক্ক ও দুর্বল। তবে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ও প্রসার পুরোপুরিভাবে না হলেও, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের কর্মপন্থায় বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এদেশের গণ-আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। সংস্কারবদ্ধ এদেশের গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না, বোঝে না, মানে না। এই মানুষগুলোর মধ্যে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মর্মকথা সম্পর্কে সঠিক, সুস্পষ্ট ও প্রয়োগমূলক দিকনির্দেশনা সরবরাহ করতে হবে। কারণ সমাজ পরিবর্তনে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিকল্প এখনো অজ্ঞাত। তাইতো বাংলাদেশের মেহনতি জনগণের মুক্তির জন্য তথা অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে কৃষি ও শিল্পভিত্তিক একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য এবং কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে বিপ্লবের মাধ্যমে যেরূপ রাষ্ট্রীয় কাঠামো দরকার তা হলো প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকসহ শ্রমজীবী জনগণ এবং সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কারণ এদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হবে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর তথা কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ধরনের কর্তব্যই পালন করতে হবে। অর্থাৎ, এখানে বিদেশি সরকার ও পুঁজিপতিদের দালাল-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র ও ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-

সংগ্রাম হবে গণতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম হবে সমাজতান্ত্রিক। তাহলেই আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের গণতন্ত্রের জায়গায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে জনগণের গণতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রজাতন্ত্রের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। আর এরই অগ্রপদক্ষেপে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। কারণ বাংলাদেশে যদি কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করে তাহলে এদেশে ধর্মীয় ক্রোন্দল, আর্থসামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটবে। তাছাড়া শুধু বাংলাদেশের জন্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা মার্ক্সবাদ কামনা করা ঠিক হবে না। যেহেতু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে নেপাল, ভুটান, ভারত, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের মানুষগুলোও বাংলাদেশের মানুষের মানুষের মতো আলো বাতাস ভোগ করে, জীবনযাপন করে, বেঁচে থাকে সেহেতু তাদের ভবিষ্যতের উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত মিশন বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্ক্সবাদ-এর অগ্রযাত্রার বাস্তবায়ন একটি বিশাল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

যেহেতু পৃথিবী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বস্তু থেকে উদ্ভূত সেহেতু মানব সমাজও বস্তু ছাড়া কিছুই নয় এবং মানবসমাজ এই বস্তুগত পৃথিবীর একটি অংশমাত্র। এতে পরিষ্কার যে, বস্তুগত পৃথিবী সম্বন্ধীয় আলোচনা মানব সমাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে দ্বান্দ্বিক নিয়মগুলো মানব সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মার্ক্স ও এঙ্গেলস দু'জনই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রসার ও ব্যাপ্তির জন্য সমাজ ও সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তর নতুন নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁরা সবসময় চেষ্টা করেছেন সমাজ বিকাশের অধিকাংশ নিয়ম বা নীতিমালাগুলোকে বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রকাশ করার জন্য। আর এই প্রচেষ্টা থেকেই পরবর্তীতে তৈরি হয় মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, যাকে মার্ক্স ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা নামে উল্লেখ করেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্ক্সীয় ও লেনিনীয় দর্শনের একটি বিশেষ অংশ, যা মানব সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে নতুন নতুন নিয়ম-প্রণালী তৈরি করে। বিশেষ করে মানব সমাজের বিকাশের জন্য তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হিসেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উদ্ভাবন করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে বুঝতে হলে মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণার প্রয়োজন হয়।

মার্ক্সীয় দর্শনের তিনটি অংশ বা শ্রেণী হলো–

$\Rightarrow$ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

$\Rightarrow$ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, যেটি মার্ক্সীয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

$\Rightarrow$ বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম।

$\rightarrow$ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দার্শনিক বক্তব্য পেশ করে বা আলোচনা করে।

$\rightarrow$ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনার আরম্ভই হলো ইতিহাসকে নিয়ে।

$\rightarrow$ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির বিশেষ আলোচনা পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক নীতিমালা বা মতবাদ সম্বন্ধে।

$\rightarrow$ একটি ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম সম্বন্ধে।

তবে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম হতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি যথার্থ পার্থক্য তৈরি করা কঠিন। কারণ একটি অপরটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। তবে দুটো মতবাদই ইতিহাস

নিয়ে আলোচনা করে। একটি পরিষ্কার ও উল্লেখযোগ্য প্রণালীবদ্ধ অভিপ্রায় (systematic will) নিম্নলিখিত বিভাজন সৃষ্টি করে :

⇒ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ⇒ পৃথিবী সম্বন্ধে সাধারণ ও ব্যাপক আলোচনা করে।

⇒ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম ⇒ (যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে) মানবজাতিরইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা (পৃথিবীর একটি অংশ হিসেবে)।

⇒ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ⇒ (আরো সংক্ষিপ্তভাবে) পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও উদ্ভব সম্বন্ধে। (ইতিহাসের একটি অংশ হিসেবে।)

জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্স[১] (Karl Heinrich Marx, ১৮১৮–১৮৮৩)-এর চিন্তাধারার একটি বৈজ্ঞানিক, প্রায়োগিক ও মৌলিক বিষয় হলো ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা (Materialist Conception of History) তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)। মার্ক্স তাঁর নিজের লেখার কোথাও 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেননি। কারণ মানব সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করার জন্য মার্ক্স ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাকে একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। তবে এঙ্গেলস[২] (Frederick Engels) তাঁর *Socialism : Utopian and Scientific* (1880) গ্রন্থে ১৮৯২ সালের ইংরেজি সংস্করণের বিশেষ ভূমিকায় ব্রিটিশদের কাছে 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা'কে সহজবোধ্য করার জন্য 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। এখানে তিনি 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন ইতিহাসের গতিধারার এমন একটি ধারণা বোঝানোর জন্য যেখানে সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন শ্রেণীতে উৎপন্ন বিভাগের মধ্যে এবং এইসব

---

[১] কার্ল মার্ক্স (Karl Heinrich Marx) ১৮১৮ সালের ৫ মে জার্মানির (Germany) প্রুশিয়া রাজ্যের (Kingdom of Prussia) রাইন প্রদেশের (Rhine province) মোজেলে নদীর তীরে অবস্থিত ট্রির (Trier) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ ইংল্যান্ডের লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] এঙ্গেলস (Frederick Engels) ১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর জার্মানির (Germany) প্রুশিয়া রাজ্যের (Kingdom of Prussia) রাইন প্রদেশের (Rhine province) বারমেন (Barmen) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৫ সালের ৫ আগষ্ট ইংল্যান্ডের লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রেণীর পারস্পরিক সংগ্রামের মধ্যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকাশক্তির অনুসন্ধান করা হয়।[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মূলত কার্ল মার্ক্সের নিজস্ব চিন্তাধারার ফসল। এঙ্গেল-এর মতে, অর্থনীতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিগুলোর অধিকাংশই এবং এই নীতিগুলোর চূড়ান্ত সুতীক্ষ্ণ সূত্রায়ণ হলো কার্ল মার্ক্সেরই অবদান। মার্ক্স ছিলেন সকলের ঊর্ধ্বে, তাঁর দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী এবং নিরীক্ষণ ছিল ব্যাপকতর ও দ্রুততর। তাঁকে ছাড়া এ তত্ত্ব আজ যাতে পরিণত হয়েছে তা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেল-এর সহজ-সরল স্বীকারোক্তিমূলক একটি টীকাভাষ্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্ক্সের মৃত্যুর তিন বছর পর ১৮৮৬ সালে '*Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy*'[২] (1886) শীর্ষক রচনার টীকাভাষ্যে এঙ্গেলস উল্লেখ করেন যে,

> ...during my 40 years' collaboration with Marx I had a certain independent share in laying the foundations of the theory, and more particularly in its elaboration. ... Marx stood higher, saw further, and took a wider and quicker view than all the rest of us. Marx was a genius; we others were at best talented. Without him the theory would not be by far what it is today. If therefore rightly bears his name.[৩]

---

[১] ...I use, in English as well as in so many other languages, the term "historical materialism", to designate that view of the course of history which seeks the ultimate cause and the great moving power of all important historic events in the economic development of society, in the changes in the modes of production and exchange, in the consequent division of society into distinct classes, and in the struggles of these classes against one another. Frederick Engels, *Socialism: Utopian and Scientific,* Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, (Moscow : Progress Publishers, 1970), p. 103.

[২] *Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy* রচনাটি ১৮৮৬ সালে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত এবং Neue Zeit পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। কিন্তু স্বতন্ত্র পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে।

[৩] Frederick Engels*, Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy,* Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.*, p. 361.

মার্ক্স আবিষ্কার করেন মানব ইতিহাস বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়ম। কারণ রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা, দর্শন ইত্যাদি চর্চা করার আগে মানুষের প্রথম প্রয়োজন হলো খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছেদ, পরিবেশ। জীবনধারণের জন্য মানুষ কিভাবে উৎপাদন করে এবং উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে—এটিই হলো একটি নির্দিষ্ট জাতি বা নির্দিষ্ট যুগের ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিকাশের মূলকথা। এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে সংশ্লিষ্ট জাতির রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিধি, আইনের ধ্যান-ধারণা, শিল্পকলা, ধর্মীয় ভাবধারা, দার্শনিক চিন্তাধারা ইত্যাদি এবং এইদিক থেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে বলে মার্ক্স মনে করেন। এজন্যই এঙ্গেলস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উৎসব্যক্তিরূপে কার্ল মার্ক্সকেই চিহ্নিত করেছেন।

মার্ক্স-এর '*The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*' (1852) গ্রন্থের তৃতীয় জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস বলেন, মার্ক্স-ই প্রথম ইতিহাসের গতিধারার এই প্রধান নিয়মটি আবিষ্কার করেন যে নিয়মটি রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন বা ভাবাদর্শের অন্য যে কোন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য না কেন, সমস্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামই হলো প্রকৃতপক্ষে সামাজিক শ্রেণী সংগ্রামের অল্পবিস্তর স্পষ্ট অভিব্যক্তি। এই শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত করে থাকে মানব সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের মাত্রা, তাদের উৎপাদন পদ্ধতি ও তার দ্বারা নির্ধারিত বিনিময় প্রথা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রাজ্যে শক্তির রূপান্তরের নিয়ম যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এই নিয়মটিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নিয়মটিকে মার্ক্স দ্বিতীয় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসকে বোঝার ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখেছিলেন। মার্ক্স রচিত '*The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*' (1852) গ্রন্থের তৃতীয় জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধে এঙ্গেলস বলেন,

> It was precisely Marx who had first discovered the great law of motion of history, the law according to which all historical struggles, whether they proceed in the political, religious, philosophical or some other ideological domain, are in fact only the more or less clear expression of struggles of social classes, ... This law, which has the same significance for

> history as the law of the transformation of energy has for natural science —this law gave him here, too, the key to an understanding of the history of the Second French Republic.[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পূর্ণভাবে মার্ক্সেরই অবদান এবং এ বিষয়টির সত্যতা এঙ্গেলস নিজেই তাঁর '*On The Hisrory of Communist League*'[২] (1885) রচনাটির মাধ্যমেও স্বীকার করেন। এঙ্গেলস-এর মতে, মার্ক্স-এর মাধ্যমেই প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় "...it is not the state which conditions and regulates civil society, but civil society which conditions and regulates the state,..."[৩] অর্থাৎ, রাষ্ট্র নাগরিক সমাজের চরিত্র নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং নাগরিক সমাজই রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং তার বিকাশ থেকেই রাজনীতি ও তার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে হবে, বিপরীতপন্থায় নয়। ১৮৪৫ সালে ব্রাসেলস্‌ে যখন মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেলস দেখা করেন তার অনেক আগেই মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান দিকগুলোকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করেন। এ সম্পর্কে এঙ্গেলস স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেন,

> ... in England, are in their turn the basis of the formation of political parties and of party struggles, and thus of all political history. ... When, in the spring of 1845, we met again in Brussels, Marx had already fully developed his materialist theory of history in its main features form the above-mentioned basis and we now applied ourselves to the detailed elaboration of the newly-won mode of outlook in the most varied directions.[৪]

---

[১] Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, (Moscow : Progress Publishers, 1969), pp. 396-397.

[২] ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লীগ (Communist League) জন্ম লাভ করে। এটিই ছিল প্রলেতারিয়েতদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন, যার কর্মসূচি ছিল কমিউনিস্ট। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। মার্ক্স রচিত 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপ প্রকাশের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে এঙ্গেলস '*On The Hisrory of Communist League*' (1885) রচনাটি তৈরি করেন। (বিস্তারিত দেখুন, Fredrick Engels, *On The Hisrory of Communist League* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume Three, op. cit., p. 190.

[৩] Ibid., p. 178.)

[৪] *Loc, cit*.

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে এটি সুস্পষ্ট যে, মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর আলোচনার সুবিধার্থে মার্ক্স ও এঙ্গেলস পরবর্তী চিন্তাধারায় তথা মার্ক্সবাদে মার্ক্স-এর 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণাটি'ই 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' নামক একটি মতবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হলো মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান উৎস হলো মার্ক্স ও এঙ্গেলস রচিত *The German Ideology*[১] (1845–46) 46) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থেই মার্ক্স বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের (communism) দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তবে মার্ক্স-এর একক রচনা হিসেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে — *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (1844), *Theses on Feuerbach* (1845)*, The Poverty of Philosophy*[২] (1847), *Wage Labour and Capital* (1847), *The Class Struggles in France, 1848-1850* (1850), *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1851-1852), *Speech at Anniversary of the People's Paper* (1856), *A Contribution to the Critique of Political Economy* (1859), *Grundrisse*[৩] (1857-1858), *Capital,* Vol. I (1867), *Capital,* Vol. III (1894), *Critique of the Gotha Programme* (1875) রচনাগুলো এবং মার্ক্স লিখিত চিঠিপত্রের মধ্যে ১৮৪৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্যারিসে পি. ভি. আন্নেন্কভ (P.V. Annenkov)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৫২ সালের ৫ মার্চ নিউইয়র্কে জে. ভেইদমেয়ার (J. Weydemeyer)-এর

---

১ *The German Ideology* গ্রন্থটির পুরো নাম হলো *The German Ideology: Critique of Modern German Philosophy According to Its Representatives Feuerbach, B. Bauer and Stirner, and of German Socialism According to Its Various Prophets*। *The German Ideology* গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৬ সাল। এই গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে বিন্যস্ত। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ফয়েরবাখের বস্তুবাদের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্রুনো বাউয়ার (Bruno Bauer) ও ম্যাক্স স্টিনার (Max Stirner)-এর ব্যক্তিবাদ ও নৈরাজ্যবাদ মিশ্রিত পেটিবুর্জোয়া বিক্ষোভসঞ্জাত সিদ্ধান্তগুলো বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মূলত 'খাঁটি সমাজতন্ত্র'-এর প্রবক্তাদের বক্তব্যগুলো আলোচনা করা হয়েছে। কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচিত এই গ্রন্থটি মূলত প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরে।

২ *The Poverty of Philosophy* গ্রন্থটির পুরো নাম হলো *The Poverty of Philosophy. Answer to the 'Philosophy of Poverty' by M. Proudhon*.

৩ *Grundrisse* হলো মার্ক্সের *Capital* গ্রন্থের খসড়া পাণ্ডুলিপি।

কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৬৮ সালে ১১ জুলাই হ্যানোভারে (Hanover) এল. কুগেলমান (L. Kugelmann)-এর কাছে লিখিত চিঠি উল্লেখযোগ্য।[১]

মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর যৌথ রচনা হিসেবে *The German Ideology* (1845–46) ছাড়াও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যান্য উৎসের মধ্যে *The Holy Family*[২] (1844), *Manifesto of the Communist Party* (1847-1848), *Address of the Central Committee to the Communist League* (1850) উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও এঙ্গেলস তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর একক রচনাগুলোর মধ্যে *The Peasant War in Germany* (1850), *Revolution and Counter-Revolution in Germany* (1851-1852), *The Housing Question* (1872-1873), *Introduction to Dialectics of Nature* (1875-76), *Karl Marx* (1877), *Anti-Duhring* (1878), *Socialism: Utopian and Scientific* (1880), *Social Classes — Necessary and Superfluous* (1881), *Origin of the Family, Private Property, and the State*

---

[১] মিলিয়ে দেখুন, Marx Engels Lenin, *On Historical Materialism: A Collection*, Compiled by Borodulina, (Moscow : Progress Publishers, 1972), p. 1-2.

[২] *The Holy Family* গ্রন্থটির পুরো নাম হলো *The Holy Family, or Critique of Critical Criticism. Against Bruno Bauer and Company*। এই গ্রন্থটি হলো কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর প্রথম যৌথ রচনা। ১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের (England) ম্যানচেস্টার (Manchester) থেকে এঙ্গেলস তাঁর জন্মভূমি জার্মানির (Germany) বারমেনে (Barmen) পরিবারের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে প্যারিসে দশদিন মার্ক্সের কাছে অবস্থান করেন। এটি ছিল তাঁদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। [মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেলসের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৪২ সালের নভেম্বরে মাসে জার্মানির (Germany) কোলনে (Cologne) 'Rheinische Zeitung' পত্রিকা অফিসে। এঙ্গেলস তাঁর নিজ শহর বারমেন (Barmen) থেকে ইংল্যান্ডের (England) ম্যাঞ্চেস্টারে (Manchester) যাওয়ার পথে এই পত্রিকা অফিসে মার্ক্স-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। মিলিয়ে দেখুন, *The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker, Princeton University, (New York, London : W.W. Norton & Company), 1978, p. XV।] প্যারিস ত্যাগ করার আগেই এঙ্গেলস তাঁর অংশটুকু লিখেছিলেন। এই গ্রন্থটির বড় অংশটি মার্ক্স কর্তৃক লেখা, যা তিনি ১৮৪৪ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে শেষ করেন। এই গ্রন্থটির মার্ক্সের অংশটি ছিল মূলত তাঁর *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844* (1844) গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা। ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *The Holy Family* গ্রন্থটি ফ্রাংকফুট (Frankfrut) থেকে প্রকাশিত হয়। দেখুন, Marx and Engels, *The Holy Family, or Critique of Critical Criticism. Against Bruno Bauer and Company,* Translated by Richard Dixon and Clemens Dutt, (Moscow : Progress Publishers, 1980), p. 262.

(1884), *On The Hisrory of Communist League* (1885), *Ludwig Feurbach and the End of German Classical Philosophy* (1886), *Preface to the First Edition 1888 English Edition of Manifesto of the Communist Party* (1888), *The 1891 Introduction to Marx's Civil War in France* (1891), *Special Introduction to the 1892 English Edition of Socialism: Utopian and Scientific* (1892) উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত চিঠিপত্রের মধ্যে ১৮৭৫ সালের ১২-১৭ নভেম্বর লন্ডনে পি. এল. লাভরভ (P. L. Lavrov)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৯০ সালের ৫ আগস্ট বার্লিনে সি. শ্মিদ (C. Schmidt)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৯০ সালের ২১ আগস্ট ব্রেসলুয়াতে (Breslau) অটো ভন বনিঙ্ক (Otto Von Boenigk)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৯০ সালের ২১-২২ সেপ্টেম্বর কনিসবার্গে (Konigsberg) জে. ব্লক (J. Bloch)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৯০ সালের ২৭ অক্টোবর বার্লিনে সি. শ্মিদ (C. Schmidt)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৯৩ সালের ১৪ জুলাই বার্লিনে এফ. মেরিং (F. Mehring)-এর কাছে লিখিত চিঠি, ১৮৯৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ব্রেসলুয়াতে (Breslau) ডব্লিউ. বরজিয়াস (W. Borgius)-এর কাছে লিখিত চিঠি উল্লেখযোগ্য।[১]

উল্লেখ্য, মার্ক্স ও এঙ্গেলস পরবর্তী মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদগণ বিশেষ করে লেনিন[২] (Vladimir Ilich Lenin) এবং স্তালিন[৩] (Joseph Stalin) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

---

[১] মিলিয়ে দেখুন, Marx Engels Lenin, *op. cit.,* p. 1-2.

[২] লেনিন (Vladimir Ilich Lenin) ১৮৭০ সালের ১০ এপ্রিল রাশিয়ার সিমবিরস্কে (Simbirsk) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি মস্কোর গোর্কি (Gorki) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি [Russian Communist Party (Bolsheviks)]-এর প্রতিষ্ঠাতা, বলশেভিক বিপ্লবের [Bolshevik Revolution (1917)] নেতা এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের (Soviet state) রূপকার, নির্মাতা ও প্রধান ব্যক্তি।

[৩] স্তালিন (Joseph Stalin) ১৮৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাশিয়ার জর্জিয়ার (Georgia) গোরি (Gori) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ রাশিয়ার মস্কোতে (Moscow) মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল (secretary-general) এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের (১৯৪১-৫৩) প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পটভূমি

১.১.১ মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় বস্তুবাদী দর্শনের সূত্রপাত

চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক কী, চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোনটি আদি, ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, না, চিরকালই জগতের অস্তিত্ব ছিল? — এ সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে দর্শনের ইতিহাসে প্রধানত দুটি মতবাদ স্থান পেয়েছে। একটি হলো ভাববাদ এবং অপরটি হলো বস্তুবাদ। ভাববাদ অনুসারে একমাত্র আমাদের চেতনারই যথার্থ অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ ভাববাদ অনুসারে বস্তুজগৎ, সত্তা বা প্রকৃতির অস্তিত্ব কেবল আমাদের চেতনার মধ্যেই রয়েছে। ভাববাদ প্রকৃতির তুলনায় চৈতন্যকে আদি বলে স্বীকার করে। ভাববাদ কোন না কোনভাবে শেষপর্যন্ত জগৎ সৃষ্টির কথাটি স্বীকার করে। যেমন, হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)-এর ভাববাদ অনুসারে, বাস্তব জগতের ক্ষেত্রে আমরা যার জ্ঞান লাভ করি তা হলো সে জগতের চেতনসার, যার কল্যাণে এ জগৎ হয়ে উঠেছে পরমভাবসত্তার ক্রমিক রূপায়ণ, যে ভাবসত্তা অনাদিকাল থেকে বিশ্বজগৎ থেকে স্বাধীনভাবে এবং বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে থেকে কোথাও না কোথাও বর্তমান ছিল। কাজেই চেতনক্রিয়া এমন একটি সারবস্তুকে জানতে সক্ষম, যা আগে থেকে একটি চেতনসার। হেগেলের মতে, চিন্তা প্রক্রিয়া ও তার চিন্তাফল বা ভাবসত্তাই হলো আদি এবং প্রকৃতি হলো উৎপন্ন বস্তু, তার (প্রকৃতির) অস্তিত্ব রয়েছে কেবল ভাবসত্তার অনুমতিসাপেক্ষ। হেগেলের ভাববাদ সম্পর্কে এঙ্গেলস তাঁর '*Ludwig Feuerbach and the End of the Classical German Philosophy*' (1886) গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> With Hegel, for example, its affirmation is self-evident; for what we cognize in the real world is precisely its thought-content — that which makes the world a gradual realisation of the absolute idea, which absolute idea has existed somewhere from eternity, independent of the world and before the world. But it is manifest without further proof that thought can know a content which is from the outset a thought-content.[১]

[১] Frederick Engels, *Ludwig Feurbach and the End of German Classical Philosophy*, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit*., p. 346.

দার্শনিক আলোচনার একটি প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান মতবাদ হলো বস্তুবাদ। বস্তুবাদ অনুসারে আমাদের চারপাশের জগতের যেসমস্ত জিনিস অস্তিত্বশীল তা হয় বস্তু অথবা শক্তি। এ মতবাদ অনুসারে সমস্ত জিনিসই বস্তু দ্বারা গঠিত এবং চেতনাসহ সমস্ত প্রপঞ্চ বস্তুর পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ বস্তুই হলো একমাত্র সারসত্তা এবং বাস্তবতা হলো শক্তি। চেতনার বাইরে চেতনা নিরপেক্ষভাবে বিষয়গতভাবে পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে। অর্থাৎ বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুই প্রধান, বস্তু কোন বুদ্ধিমান কর্তা দ্বারা সৃষ্ট নয়। বস্তু বাহ্যিকভাবে চেতনা নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। চিন্তন বা চৈতন্য হলো বস্তুরই একটি গুণধর্ম। এ মতবাদ অনুসারে পৃথিবী হলো বস্তুগত বিষয় এবং পৃথিবী ও তার নিয়মগুলো জ্ঞেয় বিষয়। বস্তুবাদ কথাটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রধানত বস্তু সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাগত ধারণাগুলোর অর্থে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তা ব্যবহৃত হয়েছে দার্শনিক অর্থে, ভাববাদের বৈপরীত্যে।[১]

এঙ্গেলস-এর মতে, বস্তুবাদ অনুসারে প্রকৃতিই একমাত্র সত্য; পক্ষান্তরে হেগেলের তত্ত্ব অনুসারে প্রকৃতি আসলে পরম ভাবসত্তার অধঃপতন বিশেষ। কারণ হেগেলের মতে, চিন্তা প্রক্রিয়া ও তার চিন্তাফল বা ভাবসত্তাই হলো আদি এবং প্রকৃতি হলো চিন্তা প্রক্রিয়া, চিন্তাফল বা ভাবসত্তা থেকে উৎপন্ন বস্তু। এঙ্গেল তাঁর '*Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy*' (1886) গ্রন্থে বলেন,

> While materialism conceives nature as the sole reality, nature in the Hegelian system represents merely the "alienation" of the absolute idea, so to say, a degradation of the idea. At all events, thinking and its thought-product, the idea, is here the primary, nature the derivative, which only exists at all by the condescension of the idea.[২]

---

[১] মিলিয়ে দেখুন, ভাসিলি ক্রাপিভিন, *দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ কী:* প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৯, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

[২] Frederick Engels, *Ludwig Feurbach and the End of German Classical Philosophy*, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit*., p. 343-344.

বস্তুবাদ অনুসারে আমাদের চেতনার বাইরে স্বতন্ত্রভাবে বা নিরপেক্ষভাবে বস্তুর অধিষ্ঠান। মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দর্শন অসুসারে বস্তুই প্রধান। কারণ বস্তুই সংবেদন, ভাবনা ও উপলব্ধির মূল। এ প্রসঙ্গে J. V. Stalin তাঁর '*Dialectical and Historical Materialism*' গ্রন্থে বলেন,

> ... the Marxist Philosophical materialism holds that matter, nature, being, is an objective reality existing outside and independent of our consciousness; that matter is primary, since it is the source of sensations, ideas, consciousness, and that consciousness is secondary, derivative, since it is a reflection of matter, a reflection of being; that thought is a product of matter which in its development has reached a high degree of perfection, ...[১]

এঙ্গেলস-এর মতে, ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায় এমন যে বস্তুজগতে আমরা আছি তাই হলো একমাত্র বাস্তব। আমাদের চেতনা ও চিন্তনক্ষমতা যতই ইন্দ্রিয়াতীত বলে মনে হোক না কেন তা আমাদের দেহের একটি বাস্তব অঙ্গ ও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল। বস্তু মনের সৃষ্ট নয়, মনই হলো বস্তুর সর্বোচ্চ বিকাশমাত্র। এঙ্গেলস তাঁর '*Ludwig Feuerbach and the End of the Classical German Philosophy*' (1886) গ্রন্থে বলেন,

> ...the material, sensuously perceptible world to which we ourselves belong is the only reality; and that our consciousness and thinking, however supra-sensuous they may seem, are the product of a material, bodily organ, the brain. Matter is not a product of mind, but mind itself is merely the highest product of matter.[২]

---

[১] J. V. Stalin, *Dialectical and Historical Materialism, Selected Works (vol-1)*, Kolkata, Prometheus Publishing House, 2012, Page- 234.

[২] Frederick Engels, *Ludwig Feurbach and the End of German Classical Philosophy*, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit*., p. 348.

মার্ক্সের চিন্তাধারার মধ্যে প্রথম থেকেই বস্তুবাদী ধারণা লক্ষ্য করা যায়। মার্ক্স ১৮৩৮ সালের শেষদিকে ব্রুনো বাউয়ার[১] (Bruno Bauer)-এর প্রেরণায় ডক্টরেট থিসিস লেখায় মনোনিবেশ করেন এবং ১৮৪১ সালের ১৫ এপ্রিল জার্মানির ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Jena) থেকে '*ডেমোক্রিটীয় ও এপিকিউরীয় জাগতিক দর্শনের মধ্যে পার্থক্য*' (*Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature*) অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। মার্ক্স তাঁর গবেষণার বিষয় হিসেবে ডেমোক্রিটাস (Democritus, খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০- ৩৭০ অব্দ) ও এপিকিউরাসকে (Epicurus, খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ - ২৭০ অব্দ) নির্বাচন করেন এই কারণে যে, এঁরা দু'জনেই বস্তুবাদী ধারণার প্রতিনিধি ছিলেন। অর্থাৎ মার্ক্স তাঁর গবেষণায় প্রাচীন গ্রিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রধান দুই দার্শনিক ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস–এর মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান তার একটি তুলনামূলক আলোচনা ও বিচার করেছেন। উল্লেখ্য প্রাচীন গ্রিসের এই দুই দার্শনিক তথা ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস–এর দর্শনের পরমাণুবাদের (Atomism) মধ্যেই সর্বপ্রথম বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বস্তুবাদী ব্যাখা পাওয়া যায়। ডেমোক্রিটাসের মতে, শূন্য থেকে কোন কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না। পরমাণু থেকেই ঈশ্বর ও বিভিন্ন দেবতাসহ জগতের সমস্ত কিছুর উৎপত্তি। এই পরমাণু সব সময়ই গতিশীল। পরমাণুর গতিশীলতার পিছনে রয়েছে প্রাকৃতিক কারণ। অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণ দ্বারাই পরমাণুর সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত। মানুষের জীবন যেহেতু পরমাণু দ্বারা গঠিত সেহেতু মানুষের জীবনও প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর পরমাণুর যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছা নেই সেহেতু মানুষেরও স্বাধীন ইচ্ছা নেই। অন্যদিকে এপিকিউরাস তাঁর দর্শনে

---

[১] ১৮৩৭ সালে বার্লিনে হেগেলীয় সম্প্রদায়ের (Hegelian School) প্রগতিশীল প্রতিনিধিদের দ্বারা ডক্টরস ক্লাব (Doctors Club) প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রুনো বাউয়ার (Bruno Bauer) ছিলেন এই ক্লাবের অন্যতম সদস্য। খ্রিস্টধর্মগ্রন্থ বাইবেল (The Bible) অবমাননার জন্য তিনি বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে বার্লিন (Berlin) বিশ্ববিদালয়ে যোগদান করেন। এই ক্লাবের সভাস্থল ছিল একটি ছোট যুবসঙ্গ রেস্তোরায় (Hippel Café)। এই ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে মার্ক্স তরুণ হেগেলীয় আন্দোলনে (The Young Hegelian movement) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মিলিয়ে দেখুন, *The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker, *op. cit*., p.8. উল্লেখ্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ হেগেলীয় গোষ্ঠীর (The Young Hegelians) সদস্যদের মধ্যে যারা হেগেলের বক্তব্য শুনেছিলেন তাঁদের মধ্যে আর্নল্ড রুগে (Arnold Ruge, ১৮০২-১৮৮০), ফয়েরবাখ (Ludwig Feuerbach, ১৮০৪-১৮৭২), ম্যাক্স স্টিনার (Max Stirner, ১৮০৬-১৮৫৬), ডেভিড স্ট্রাউস (David Strauss, ১৮০৮-১৮৭৪), ব্রুনো বাউয়ার (Bruno Bauer, ১৮০৯-১৮৮২) ও তাঁর ছোট ভাই এডগার বাউয়ার (Edgar Bauer, ১৮২০-১৮৮৬), মোসেজ হেস (Moses Hess, ১৮১২-১৮৭৫), আগস্ট ভন চিজকোস্কি (August von Cieszkoski, ১৮১৪-১৮৯৪), কার্ল মার্ক্স (Karl Marx, ১৮১৮-১৮৮৩), এঙ্গেলস (Frederick Engels, ১৮২০-১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য।

ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদকে গ্রহণ করলেও পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তাঁর মতে, যেহেতু পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছা আছে সেহেতু মানুষের জীবন স্বাধীন ও ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত। মানুষ আপন ইচ্ছায় জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে। তাহলে ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস–এর পরমাণুবাদ অনুসারে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূলশক্তি ঈশ্বর নন। বরং বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূলশক্তি হলো পরমাণু (Atom) এবং মহাশূন্যতা (Vacuum)। মার্ক্স তাঁর গবেষণায় দেখান যে, ডেমোক্রিটাস ও এপিকিউরাস–এর চিন্তাধারার মধ্যেই ইউরোপে সর্বপ্রথম ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে বস্তুগত ধারণায় নামিয়ে আনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ১৮৩৭ সালের ১০ নভেম্বর বার্লিন থেকে মার্ক্স-এর পিতার (Heinrich Marx) কাছে লিখিত চিঠির একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। এই চিঠিতে মার্ক্স তাঁর পিতাকে লেখেন, "If previously the gods had dwelt above the earth, now they became its centre."[১] অর্থাৎ, এতদিন দেবতাদের বসবাস ছিল পৃথিবী ছাড়িয়ে, এখন তাঁরা বাস করেন পৃথিবীর মধ্যেই।

মার্ক্স-এর মতে, এপিকিউরাস তাঁর পরমাণু ধারণার মধ্যে সারসত্তা ও অস্তিত্বের মধ্যকার বিরোধিতাকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করে আমাদেরকে পরমাণু সংক্রান্ত বিজ্ঞান উপহার দিয়েছেন। অন্যদিকে, ডেমোক্রিটাসের মধ্যে নিজস্ব নীতির কোন উপলব্ধি নেই। তিনি শুধু বস্তুগত দিককে অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং অভিজ্ঞতাবাদী পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য প্রকল্প প্রদান করেছেন। মার্ক্স বলেন,

> ...that Epicurus objectifies the contradiction in the concept of the atom between essence and existence. He thus gave us the science of atomistics. In Democritus, on the other hand, there is no realisation of the principle itself. He only maintains the material side and offers hypotheses for the benefit of empirical observation.[২]

এছাড়া মার্ক্স তাঁর গবেষণায় এপিকিউরীয়বাদের (Epicureanism) সঙ্গে স্টোয়িকবাদের (Stoicism) সম্পর্ক, সক্রেটিস (Socrates, খ্রিস্টপূর্ব ৪৭০ - ৩৯৯ অব্দ) ও

---

১ *Ibid.,* p. 7.

২ Karl Marx, *Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature,* Marx Engels Collected Works, Vol-1, (Moscow : Progress Publishers, 1975), p. 58.

প্লেটোর (Plato, খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮/৪২৭ - ৩৪৮/৩৪৭ অব্দ) ধর্মমত থেকে হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ১৭৭০-১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ) পরবর্তী দার্শনিক ধারা মূল্যায়ন করেছেন এবং উক্ত গবেষণার পরিশিষ্টে তিনি হেগেল ও শেলিং (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, ১৭৭৫-১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ) সম্পর্কেও মন্তব্য যুক্ত করেছেন।

মার্ক্স তাঁর '*Theses on Feuerbach*' (1845) গ্রন্থটির মাধ্যমে ফয়েরবাখের[১] বস্তুবাদসহ পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের প্রধান ত্রুটিগুলো উল্লেখ করে বলেন, পূর্ববর্তী বস্তুবাদে বস্তু, বাস্তবতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে কেবল বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চিন্তাকর্তা জগৎকে কেবল বাহ্যিক বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু চিন্তাকর্তার প্রায়োগিক কর্ম হিসেবে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে বস্তুবাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এইজন্যই মার্ক্স তাঁর '*Theses on Feuerbach*' (1845) গ্রন্থের ১১ নম্বর সংকল্পে বলেন, "The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is to change it."[২] অর্থাৎ দার্শনিকরা কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল হলো তাকে পরিবর্তন করা। তাঁর মতে, পুরাতন বস্তুবাদে বস্তু, বাস্তবতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে মানব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়া

---

[১] লুডউইগ ফয়েররাখ (Ludwig Feuerbach, ১৮০৪-১৮৭২) হলেন জার্মান বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি ১৮০৪ সালের ২৪ জুলাই বর্তমান জার্মানির বাভারিয়ার (Bavaria) ল্যান্ডসুট (Landshut) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর জার্মানির রিসেনবার্গ (Rechenberg) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বার্লিনে দুই বছরের জন্য হেগেলের কাছে দর্শনের ছাত্র হিসেবে ধর্মতাত্ত্বিক (theological) শিক্ষা গ্রহণ করেন। হেগেলের ভাববাদের সমালোচনা এবং ধর্মের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করার জন্য এঙ্গেলস, মার্ক্স ও সমসাময়িক অন্যান্য বস্তুবাদী চিন্তাবিদের উপর তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে Thoughts on Death and Immortality (*Gedanken über Tod und Unsterblichkeit*) (১৮৩০), *On Philosophy and Christianity* (*Über Philosophie und Christentum)* (১৮৩৯), *The Essence of Christianity* (*Das Wesen des Christentums*) (১৮৪১)*, Preliminary Theses on the Reform of Philosophy* (1842), *Principles of the Philosophy of the Future* (1843) উল্লেখযোগ্য।

[২] Karl Marx, *Theses on Feuerbach,* Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Volume 5, (New York : International Publishers, 1975), p. 5.

হিসেবে এবং প্রায়োগিক কর্ম হিসেবে বা বিষয়ীগতভাবে দেখা হয়নি। ফলে পুরাতন বস্তুবাদের বিপরীতে ভাববাদ বিকাশ লাভ করেছে।[১]

ধর্মীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখ (Ludwig Feuerbach) রচিত যুগান্তকারী গ্রন্থ '*The Essence of Christianity*' (1841) কার্ল মার্ক্সকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এই গ্রন্থে অতীন্দ্রিয় শক্তিকে অস্বীকার করে ফয়েরবাখ দেখান যে, মানুষ ও মানুষের জগৎই প্রাথমিকভাবে সত্য। জাগতিক বিকৃতি ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। অর্থাৎ ধর্মের ধারণা মানুষেরই তৈরি। মানুষ তার আদর্শ সত্তাকে ধর্মের প্রতিচ্ছায়ায় স্থাপন করে দেখে। ধর্ম কোন প্রকৃত সত্তাকে উন্মুক্ত করে না। পরমভাবের প্রবাহ থেকে মানুষের জন্ম হয় না। কিন্তু মানুষের মনের ভাব থেকেই ঈশ্বর ও ধর্মের উদ্ভব। এভাবে মানুষ পরমভাব তথা ঈশ্বরের কল্পনা করে থাকে। ফয়েরবাখের মতে, পরম শক্তি বা ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা মানবজাতির কাছে নেই, মানবজাতি নিজের শক্তিতেই শক্তিমান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাস্তব জগৎ নিয়েই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। অন্যদিকে, হেগেলীয় ভাববাদের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে ফয়েরবাখ বলেন, ধর্ম মানবজাতির কল্পনাপ্রসূত, মানুষের স্রষ্টা ঈশ্বর নন, মানুষের স্রষ্টা হলো প্রকৃতি। প্রকৃতি ও মানুষের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমাদের ধর্মীয় কল্পনায় যেসকল উচ্চতর সত্তা উদ্ভাবিত হয়েছে তারা হলো আমাদের নিজেদেরই সত্তার কাল্পনিক প্রতিবিম্বমাত্র। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেল তাঁর '*Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy*' (1886) গ্রন্থে বলেন,

---

[১] ... Hence it happened that the active side, in contradistinction to materialism, was developed by idealism—but only abstractly, since, of course, idealism does not know real, sensuous activity as such. Feuerbach wants sensuous objects, really differentiated from thought objects, but he does not conceive human activity itself as objective [*gegenständliche*] activity. Hince in the *Essence of Christianity*, he regards the theoretical attitude as the only genuinely human attitude, while practice is conceived and fixed only in its dirty-judaical form of appearance. Hence he does not grasp the significance of 'revolutionary', of 'practical-critical', activity. Karl Marx, *Theses on Feuerbach,* Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit*., p. 13.

> Then came Feuerbach's *Essence of Christianity*. ... Nothing exists outside nature and man, and the higher beings our religious fantasies have created are only the fantastic reflection of our own essence. The spell was broken; the "system" was exploded and cast aside, and the contradiction, shown to exist only in our imagination, was dissolved. One must himself have experienced the liberating effect of this book to get an idea of it. Enthusiasm was general; we all became at once Feuerbachians.[১]

হেগেলীয় ভাববাদ অনুসারে বিশুদ্ধ ভাবের বিকাশ থেকেই বিশ্বের জন্ম এবং এই বিশ্বজগৎ হলো পরমভাবের প্রকাশ। হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)-এর '*Philosophy of Right*' গ্রন্থের একটি বিখ্যাত উক্তি হলো–'যা বাস্তব তাই বৌদ্ধিক, যা বৌদ্ধিক তাই বাস্তব'[২]। হেগেল মনে করেন, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঐক্য হিসেবে বাস্তবতা (actuality) স্বরূপত আবশ্যিকতার অধিকারী। আর আবশ্যিকতাই হলো বৌদ্ধিকতা। এই আবশ্যিকতা বাহ্যিক ও যান্ত্রিক আবশ্যিকতা নয়, বরং যৌক্তিক আবশ্যিকতা। হেগেলের মতে, যে নিজেই নিজের ভিত্তি বা হেতু, তারই কেবল বৌদ্ধিক আবশ্যিকতা থাকতে পারে। যেমন, গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধতা। কিন্তু অনিয়ত সত্তার ভিত্তি নিজের মধ্যে থাকে না, থাকে অন্যত্র। যেমন, একটি বিড়াল কালো রঙের হওয়া তার বংশধারা ইত্যাদি বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এমন বাহ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আবশ্যিকতা যান্ত্রিক আবশ্যিকতা মাত্র। কিন্তু বাস্তবতা হলো যৌক্তিক আবশ্যিকতা তথা বৌদ্ধিকতা। বাস্তবতা বলতে হেগেল নির্দিষ্টতা, ইন্দ্রিয়জ মূর্ততা, ব্যষ্টিত্বকে বুঝিয়েছেন। হেগেলর মতে, পরম ধারণা তথা বাস্তবসত্তা বৌদ্ধিক এবং এই জগৎ তারই মূর্ত প্রকাশ।[৩] মার্ক্স-এর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি থেকে শুধু ভিন্নই

---

[১] Frederick Engels, *Ludwig Feurbach and the End of German Classical Philosophy*, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit*., p. 344.

[২] What is rational is real; And what is real is rational. মিলিয়ে দেখুন, G.W.F. Hegel, *Reading Hegel the introduction,* Edited and Introduced by Aakash Singh and Rimina Mohapatra, (Australiaa : Melbourne, 2008), P. 87

[৩] মিলিয়ে দেখুন, পারভেজ ইমাম, *হেগেল : জীবন ও দর্শন*, (কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী), ২০০৭, পৃ. ৯১.

নয়, একেবারে বিপরীত। মানব মস্তিষ্কের জীবন প্রক্রিয়া তথা চিন্তনপ্রক্রিয়া যাকে হেগেল 'ভাব' নামে একটি স্বতন্ত্র সত্তায় পরিণত করেছেন এবং এই ভাব হলো বাস্তব জগতের স্রষ্টা এবং বাস্তব জগৎ হলো এই 'ভাব'-এর দৃশ্যমান বাহ্যিকরূপ। কিন্তু মার্ক্স-এর মতে, মানব মনের মধ্যে বাস্তব জগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তার মধ্যে যে বিভিন্নরূপে পরিণত হয়, তা ব্যতীত 'ভাব' আর কিছুই নয়।

মার্ক্স তাঁর '*Capital*' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেন, হেগেলের কাছে জীবন বা মনন প্রক্রিয়া হলো বাস্তবতার নির্মাতা বা স্রষ্টা। হেগেল এই প্রক্রিয়াকে একটি স্বাধীন কর্তায় পরিণত করে 'ভাব' ("the Idea,") নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। এজন্যই মার্ক্স মন্তব্য করেন যে, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মাথায় ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। রহস্যের খোলসের ভিতর থেকে যুক্তিসিদ্ধ শাঁসটিকে আবিষ্কার করতে হলে একে আবার ঘুরিয়ে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে হবে।[১]

হেগেলের দর্শনকে কেন্দ্র করে ফয়েরবাখের বাস্তববাদী, নিরীশ্বরবাদী ও মানবতাবাদী বিচার বিশ্লেষণ চিন্তার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। কিন্তু মার্ক্স-এর বিশ্লেষণে ফয়েরবাখের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। মার্ক্স বলেন,

> Feuerbach, therefore, never speaks of the world of man in such cases, but always takes refuge in external nature, and moreover in nature which has not yet been subdued by men. But every new invention, every advance made by industry, detaches another piece from this domain, so that the ground which produces examples illustrating such Feuerbachian propositions is steadily shrinking.[২]

---

[১] My dialectic method is not only different from the Hegelian, but is its direct opposite. ... The mystification which dialectic suffers in Hegel's hands, by no means prevents him from being the first to present its general form of working in a comprehensive and conscious manner. With him it is standing on its head. It must be turned right side up again, if you would discover the rational kernel within the mystical shell. Karl Marx, *Capital,* Vol. I, Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Volume 35 (New York: International Publishers, 1996) p. 5.

[২] Karl Marx and Frederick Engels, *The German Ideology,* Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 46.

Dhaka University Institutional Repository

মার্ক্স-এর মতে, হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ফয়েরবাখ খ্রিস্টধর্মের অবাস্তবতা দেখাতে সক্ষম হলেও মানব সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুবাদের প্রয়োগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফয়েরবাখ বস্তুকে কেবল বস্তু হিসেবেই বিচার করেছেন, মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবেই বিচার করেছেন। 'মানুষ' ধারণাটিকে তিনি 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়' হিসেবে গণ্য করেন। মানুষ নিজেকে যেভাবে উপলব্ধি করে সেই সক্রিয় উপলব্ধি থেকেই সমাজে 'মানুষ' নামক ধারণাটির উদ্ভব হয় বলে ফয়েরবাখ মনে করেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে মানুষ যেভাবে নিজেকে উপলব্ধি করে সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সক্রিয়তার জায়গা থেকেই মানুষের নিজের সম্পর্কে নিজের ধারণা গড়ে উঠে। নিজেকে নিজে জানা, বোঝা ও নির্মাণের ক্ষেত্রে সামাজিক মানুষের ইন্দ্রিয় উপলব্ধির উপর গুরুত্বারোপ করে ফয়েরবাখ মানুষকে বিচার করেছেন সমাজ ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ত বা ভাবমূলক মানুষ হিসেবে, জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের আদর্শ বা ধারণা হিসেবে, সামাজিক সম্পর্কহীন জৈবসত্তা হিসেবে। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস-এর মতে, ফয়েরবাখ মূলত তত্ত্বের বেড়াজালে বন্দী হয়েছেন। তিনি সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষকে উপলব্ধি করতে পারেননি। কাজেই ফয়েরবাখের পদ্ধতি মানুষের পরিবর্তনশীল ইতিহাস অনুসন্ধান করে না। এছাড়া জীবনের বিরাজমান শর্তের কোন পর্যালোচনা ফয়েরবাখ করতে পারেননি। ফলে তিনি কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে এবং এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উপাদান হিসেবে জীবন্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানুষের কর্মতৎপরতা উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু মার্ক্স তাঁর বস্তুবাদী চিন্তাধারার আলোকে মানুষের কর্মতৎপরতাকে শিল্পোৎপাদন ও সামাজিক কাঠামো উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এভাবে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস তাঁদের *The German Ideology* (1845–46) গ্রন্থে মাধ্যমে দেখান যে, ফয়েরবাখ যতটুকু বস্তুবাদী তাতে ইতিহাস তাঁর বিষয় নয়, আবার যতটুকু ইতিহাস বিবেচনা করেন তাতে তিনি বস্তুবাদী নন। তাঁর বস্তুবাদ ও ইতিহাস পরস্পর বিপরীতগামী।[১]

---

[1] Certainly Feuerbach has a great advantage over the "pure" materialists in that he realises how man too is an "object of the senses." ... He gives no criticism of the present conditions of life. Thus he never manages to conceive the sensuous world as the total living sensuous *activity* of the individuals composing it; and therefore when, for example, he sees instead of healthy men a crowd of scrofulous, overworked and consumptive starvelings, he is compelled to take refuge in the "higher perception" and in the ideal "compensation in the species," and thus to relapse into idealism at the very point where the communist materialist sees the necessity, and at the same time the condition, of a transformation both of industry and of the social structure. Karl Marx and Frederick Engels, *The German Ideology,* Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Volume 5, (New York: International Publishers, 1975) pp. 40-41.

ফয়েরবাখের চিন্তাধারাকে সমালোচনা করে মার্ক্স বলেন, বস্তুকে নিছক বস্তু বলে বিচার করলে চলবে না, বিমূর্ত মানুষকে মূর্ত রূপ দিয়ে বিচার করতে হবে। কারণ বিমূর্ত মানুষের চারপাশে কোন পরিবার পরিজন এবং আর্থিক ও জাগতিক বন্ধন থাকে না। ফলে বিমূর্ত মানুষ পরিণত হয় বিচ্ছিন্ন সামাজিক সম্পর্কহীন ব্যক্তি মানুষে। মার্ক্স-এর দৃষ্টি ছিল ব্যবহারিক জগতের দিকে। তিনি দেখিয়েছেন বিশেষ মানুষকে, যে মানুষ বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ মার্ক্স গুরুত্ব দিয়েছেন মনুষ্যত্বের আদর্শ বা ধারণার স্থলে বাস্তব মানুষের উপর। এই বাস্তব মানুষ পরিবেশ-প্রভাবের চাপে বিমূর্ত থাকে না। সে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, বিশেষ করে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সে নিজেকে যুক্ত করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিণতিস্বরূপ বাস্তব মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মার্ক্স-এর মতে, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের সম্মিলিত রূপই হলো মানুষের সারবস্তু। এইজন্যই মার্ক্স পুরাতন বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'নাগরিক' সমাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং নতুন বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'মানবিক' সমাজ বা সামাজিক মানবতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মার্ক্স তাঁর *Theses on Feuerbach* রচনাটির ১০ নম্বর সংকল্পে বলেন,

> "The standpoint of the old materialism is civil society; the standpoint of the new is human society or social humanity."[১]

মার্ক্স একদিকে যেমন ভাববাদের অসংগতি তুলে ধরেন, অন্যদিকে তেমন প্রচলিত বস্তুবাদ বিশেষ করে অতীতের বস্তুবাদী মতেরও অসংগতি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, অতীতের বস্তুবাদ অনুসারে বাস্তব হলো মূল বিষয় (object) এবং মানুষের চেতনা ঐ বিষয়কে প্রতিবিম্বিত করে মাত্র। মার্ক্স-এর পদ্ধতি ছিল ঐতিহাসিক এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবধর্মী। '*The German Ideology*' (1845-46) গ্রন্থটির মাধ্যমে বস্তুবাদকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে করে যুক্ত মার্ক্স প্রথম বস্তুবাদকে পদ্ধতিগতভাবে সূত্রবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস-এর একটি প্রধান বক্তব্য হলো–"It is not consciousness that determines, but life that determines consciousness."[২] অর্থাৎ, চেতনা জীবনকে নির্ণয় করে না, বরং জীবনই চেতনাকে নির্ণয় করে। ভাববাদ অনুসারে, চেতনা বা ভাবের মাধ্যমে জগৎ ও তার বিকাশ

---

[১] Karl Marx, *Theses on Feuerbach,* Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Volume 5, Progress Publishers, Moscow, 1976, p. 5.

[২] Karl Marx and Frederich Engels, *The German Ideology,* Marx Engels Collected Works, Vol-5, *Loc. cit.,* p. 37.

ব্যাখ্যাত হয়। অর্থাৎ, ভাববাদীদের মতে, চিন্তা বা চেতনা, ভাব, ধ্যান-ধারণা, ধর্ম, দর্শন, বিশ্বাস দ্বারা মানুষের জীবন নির্ণীত হয়। কিন্তু মার্ক্স-এর মতে, **বস্তুর মাধ্যমে জগৎ ও তার বিকাশ ব্যাখ্যাত হয়। বস্তুই হলো চেতনা বা ভাবের মূল উৎস। মানব সমাজের বিকাশের ভিত্তিও হলো বস্তুশক্তি এবং তার বিবর্তন। তাই মানুষের জীবন চিন্তা বা চেতনা দ্বারা নির্ণীত হয় না। জীবনই হলো আসল বিষয়, জীবনই হলো বস্তুময় এবং এই বস্তুময় জীবনই হলো মানুষের চিন্তা বা চেতনা নির্ধারক ও নির্ণায়ক।**

সামাজিক গতিকে মার্ক্স প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি প্রক্রিয়া বলে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, যে নিয়ম দ্বারা সামাজিক গতি পরিচালিত তা মানুষের ইচ্ছা, চেতনা এবং বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নয়। বরং ইচ্ছা, চেতনা এবং বুদ্ধিই তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাসে চৈতন্যের ভূমিকা যদি এমনই গৌণ হয়ে থাকে তাহলে এটি স্বতঃসিদ্ধ যে চৈতন্যের কোন রূপ কিংবা পরিণতি সভ্যতা সম্পর্কে তত্ত্বান্বেষী গবেষণার অন্তত কোন ভিত্তি হতে পারে না। সেই গবেষণার মূলসূত্র ভাব নয়, একমাত্র বস্তুই।[১] এভাবে হেগেলের ভাববাদ ও ফয়েরবাখের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনার মাধ্যমে মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় বস্তুবাদ একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.১.২ কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তনের নিয়মাবলি ও চালিকাশক্তিগুলো সম্পর্কে যে সাধারণ মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মার্ক্স-এর চিন্তাধারায় প্রথমত বস্তুবাদ একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। তিনি বস্তুবাদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনার পাশাপাশি ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

[১] Marx treats the social movement as a process of natural history, governed by laws not only independent of human will, consciousness and intelligence, but rather, on the contrary, determining that will, consciousness and intelligence. ... If in the history of civilisation the conscious element plays a part so subordinate, then it is self-evident that a critical inquiry whose subject-matter is civilisation, can, less than anything else, have for its basis any form of, or any result of, consciousness. ...the material phenomenon alone can serve as its starting-point. Such an inquiry will confine itself to the confrontation and the comparison of a fact, not with ideas, but with another fact. মিলিয়ে দেখুন, Karl Marx, *Capital*, Volume One, *op. cit.,* p. 300.

তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মার্ক্সের সমস্ত লেখার মধ্যেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।[১] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পূর্ণভাবে মার্ক্সের চিন্তাধারার ফসল–এ বিষয়টির সত্যতা এঙ্গেলস নিজেই তাঁর '*On The Hisrory of Communist League*'[২] (1885) রচনাটির মাধ্যমে স্বীকার করেন।

এঙ্গেলস-এর মতে, মার্ক্স-এর মাধ্যমেই প্রথম সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় 'রাষ্ট্র নাগরিক সমাজের চরিত্র নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং নাগরিক সমাজই রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে'।[৩]

মার্ক্স-এর চিন্তাধারা প্রথম থেকেই যে আধুনিক বস্তুবাদী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অন্যতম প্রমাণ হলো '*Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right: Introduction*' (1844) নামক প্রবন্ধটি।[৪] এই প্রবন্ধে তিনি বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনাকালে ইতিহাসের বিকাশ এবং আধুনিক পুঁজিবাদী সামাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হেগেলের দর্শন সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বস্তুগত শক্তির দ্বারাই বস্তুগত শক্তিকে উৎখাত করতে হবে। কোন তত্ত্বকে বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হয়। কোন তত্ত্ব জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করলেই তা মানুষকে প্রতিপাদন করতে সক্ষম হবে। আর

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* p. 488.

[২] ১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লীগ (Communist League) জন্ম লাভ করে। এটিই ছিল প্রলেতারিয়েতদের প্রথম আন্তর্জাতিক সংঠন, যার কর্মসূচি ছিল কমিউনিস্ট। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস কমিউনিস্ট লীগ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। মার্ক্স রচিত 'কলোনে কমিউনিস্টদের বিচারের স্বরূপ প্রকাশের' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা হিসেবে এঙ্গেলস '*On The Hisrory of Communist League*' (1885) রচনাটি তৈরি করেন। বিস্তারিত দেখুন, Fredrick Engels, *On The Hisrory of Communist League,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* pp. 177-190.

[৩] "...it is not the state which conditions and regulates civil society, but civil society which conditions and regulates the state,..." (মিলিয়ে দেখুন, *Ibid.,* p. 178.)

[৪] ১৮৪৪ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'জার্মান-ফরাসি-ইয়ারবুক' (*Deutsch-französische Jahrbücher*) / German-French Yearbooks) পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মার্ক্স রচিত '*হেগেলের ন্যায় দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে*' (*Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right*) এবং '*ইহুদি প্রশ্ন প্রসঙ্গে*' (*On the Jewish Question*) নামক এই প্রবন্ধ দুটি স্থান পায়।

মানুষের এই প্রতিপাদন তখনই হয় যখন তা আমূল পরিবর্তনকামী হয়। মার্ক্স-এর মতে, আমূল পরিবর্তনকামী হওয়ার জন্য বস্তুর মূল উৎস সন্ধান করতে হবে। মানুষই হলো এই মূল উৎস। তিনি জার্মান তত্ত্বের আমূল পরিবর্তনকামী মতবাদের সন্দেহাতীত প্রমাণ হিসেবে রাজনৈতিক শক্তির কথা বলেন। কেননা জার্মানিতে রাজনৈতিক শক্তির সূচনা হয়েছিল ধর্মতত্ত্বের সদর্থক বিলোপ সাধনের মাধ্যমে। তিনি বলেন, ধর্মের সমালোচনা নিছক ধর্মের বিষয় নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ধর্মের সমালোচনা করা সম্ভব। মার্ক্স বলেন, "Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the *opium* of the people."[১] অর্থাৎ, 'ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয় এবং আত্মাহীন অবস্থার আত্মা। ধর্ম হলো জনগণের আফিম'। তিনি ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা শেষে বলেন, মানুষের কাছে মানুষই সর্বাপেক্ষা উন্নত জীবসত্তা। কাজেই যেখানে মানুষ অধঃপতিত, ক্রীতদাসে পরিণত, অবহেলিত এবং ঘৃণ্য সত্তা হয়ে আছে সেখানে এমন সম্পর্কগুলোকে অনিবার্যভাবেই উৎখাত করতে হবে। মার্ক্স তাঁর '*Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right: Introduction*' (1844) প্রবন্ধে বলেন,

> ... Material force can only be overthrown by material force; but theory itself becomes a material force when it has seized the masses. Theory is capable of seizing the masses when it demonstrates *ad hominem*, and it demonstrates *ad hominem* as soon as it becomes radical. To be radical is to grasp things by the root. But for man the root is man himself.[২]

Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right: Introduction (1844) প্রবন্ধে মার্ক্স একদিকে বস্তুবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন, অন্যদিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অধঃপতিত,

---

[১] Karl Marx, *Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right: Introduction, The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker, *op. cit.,* p. 54.

[২] *The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker, *op. cit.,* p. 60.

ক্রীতদাসে পরিণত, অবহেলিত এবং ঘৃণ্যসত্তা সদৃশ মানুষের সম্পর্কগুলোকে অনিবার্যভাবে উৎখাত করার জন্য চালিকাশক্তির প্রয়োজন। প্রলেতারিয়েত[১] শ্রেণীই হলো সেই চালিকাশক্তি, যারা বাস্তব পরিস্থিতিতে সমস্ত সম্পর্ক উৎখাত করতে সক্ষম হবে। কাজেই ঐতিহাসিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সংগ্রামের তাৎপর্যের উপর গুরত্বারোপ করে মার্ক্স ভাববাদী সকল ধারণার মূলে আঘাত করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র, সামাজিক সম্পদ ও শ্রমশিল্পের মধ্যেকার সম্পর্ক বিচারে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর উদ্ভব ও সামাজিক ভূমিকা নির্মিত হয়েছে। মার্ক্স তাঁর '*Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right: Introduction*' (1844) প্রবন্ধে বলেন,

> When the proletariat announces the dissolution of existing social order, it only declares the secret of its own existence, for it is the effective dissolution of this order. When the proletariat demands the negation of private property it only lays down as a principle for society what society has already made a principle for the proletariat, and the latter already involuntarily embodies as the negative result of society.[২]

মার্ক্স রচিত '*Economic Philosophic Manuscripts of 1844*' (1844) গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে তিনি বলেন, মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃতি হলো বস্তুজগৎ, মানুষ হলো ব্যক্তিমানুষ এবং সমাজ হলো ব্যক্তি ও ব্যক্তির সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন। মানুষ প্রকৃতির অংশ হলেও প্রকৃতি ও মানুষ এক নয়। কারণ প্রকৃতি হলো নিষ্ক্রিয় কিন্তু মানুষ হলো সক্রিয়। শ্রম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। অর্থাৎ মানুষ নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার প্রকৃতির মতো নিষ্ক্রিয় শক্তির সঙ্গে মানুষের মতো

---

[১] প্রলেতারিয়েত বলতে আধুনিক মজুরি শ্রমিকশ্রেণীকে বুঝায়, যাদের নিজেদের কোন উৎপাদনের উপকরণ না থাকার জন্যে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ("By proletariat, the class of modern wage labourers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labour power in order to live.")। মিলিয়ে দেখুন টীকাভাষ্যে, Marx and Engels*, Manifesto of the Communist Party, Marx-Engels-Collected-Works,*volume-6, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 582.

[২] *The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker *op. cit.,* p. 65.

সক্রিয় শক্তিরও সংগ্রাম করতে হয়। এভাবেই মানুষ প্রকৃতিকে এবং নিজেকে ক্রমাগত বিকশিত করে চলে। এই কারণে মানুষ শুধুমাত্র প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। মানুষ হলো ঐতিহাসিক যুগের সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স তাঁর '*Economic Philosophic Manuscripts of 1844*' (1844) গ্রন্থে বলেন,

> "Man *lives* on nature – means that nature is his *body*, with which he must remain in continuous interchange if he is not to die. That man's physical and spiritual life is linked to nature means simply that nature is linked to itself, for man is a part of nature."[১]

মার্ক্স তাঁর '*Economic Philosophic Manuscripts of 1844*' (1844) গ্রন্থে আরো দেখান যে, প্রচলিত পণ্য উৎপাদন প্রণালীর পরিবেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির দুষ্ট প্রভাবে একদিন বিপ্লব জন্ম নেবে। এই বিপ্লবই পুঁজিবাদের সমাধি রচনা করবে। মার্ক্স বলেন,

> It is necessary that this appearance be abolished—that landed property, the root of private property, be dragged completely into the movement of private property and that it become a commodity; that the rule of the proprietor appear as the undisguised rule of private property, of capital, freed of all political tincture; that the relationship between proprietor and worker be reduced to the economic relationship of exploiter and exploited;...[২]

মার্ক্স ও এঙ্গেলস রচিত '*The Holy Family*' (1844) গ্রন্থটিতে দুটি প্রধান বিষয় লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমত,** হেগেলীয় ভাববাদের যথার্থ ও সুনিপুণ সমালোচনা এবং **দ্বিতীয়ত,** মার্ক্সের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মূলত এ গ্রন্থেই দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মৌলিক দিকগুলো প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ গ্রন্থেই মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল ধারণা

---

১ Karl Marx, *Economic Philosophic Manuscripts of 1844, The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker *op. cit.,*p. 75.

২ Marx, *Economic & Philosophic Manuscripts of 1844*, *Marx-Engels-Collected-Works,*volume-3, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 267.

অর্থাৎ সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির ভূমিকা ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেন,

> As far as immediate material production is concerned, the decision whether an object is to be produced or not, i.e., the decision on the *value* of the object, will depend essentially on the labour time required for its production. For it depends on time whether society has time to develop in a human way.[১]

'*The Holy Family*' (1844) গ্রন্থে মার্ক্স বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। উদারহরণস্বরূপ, ফরাসি বিপ্লবের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করে মার্ক্স দেখান যে, উদীয়মান বুর্জোয়া[২] শ্রেণীস্বার্থের সহযোগী ছিল বলেই ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারা বিপ্লবের ক্ষেত্রে জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিপ্লবের চেতনা বৈপ্লবিক কর্মধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। একমাত্র প্রলেতারিয়েত শ্রেণীই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। কারণ প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর রয়েছে বাস্তব কাজের ক্ষমতা। তাইতো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান তাদেরকে মুক্তির সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রলেতারিয়েত শ্রেণী নিজেদের জীবনযাত্রার অমানবিক অবস্থার ধ্বংস সাধন না করে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে না। সমকালীন সমাজে জীবনধারণের ক্ষেত্রে যে অমানবিক অবস্থা রয়েছে তা সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী নিজেদের জীবনযাত্রার অবস্থার অবসান ঘটাতে পারে না। কাজেই সমকালীন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার

---

১ Marx and Engels, *The Holy Family, or Critique of Critical Criticism. Against Bruno Bauer and Company,* Translated by Richard Dixon and Clemens Dutt, *op. cit.,* pp. 62-63.

২ বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণীকে বুঝায়, যারা সামাজিক উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক এবং যারা মজুরি-শ্রমের মালিক। ("By bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labour.")। মিলিয়ে দেখুন টীকাভাষ্যে, Marx and Engels*, Manifesto of the Communist Party, Marx-Engels-Collected-Works,*volume-6, ***op. cit.,*** p. 582.

কাঠামোর মধ্যেই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর লক্ষ্য এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা অনিবার্যভাবে ও সুস্পষ্টভাবে পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে।[১]

মার্ক্স বস্তুবাদী চিন্তাধারার আলোকে মানবসমাজ ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করেছেন, যা ইতঃপূর্বে হেগেল ও ফয়েরবাখের চিন্তাধারায় পাওয়া যায়নি। '*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে মার্ক্স বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের (communism) দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিশদ ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। এই গ্রন্থেই হেগেল ও ফয়েরবাখের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে সংস্কার করে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করেন। ভাববাদীরা যেখানে চৈতন্য বা ভাবের মাধ্যমে জগৎ ও তার বিকাশ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন, মার্ক্স সেখানে বস্তুর মাধ্যমে জগৎ ও বিকাশের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন। মার্ক্স-এর মতে, মানবসমাজ বিকাশের ভিত্তি হলো বস্তুশক্তি ও তার পরিবর্তন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে কোন জিনিস বা কোন বিষয়ই স্থির বা নিশ্চল নয়। সমস্ত জিনিসই নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ও পরিবর্তনের অবস্থায় রয়েছে এবং পরিমাণগত পরিবর্তন এক সময় গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। বস্তু বা বিষয়ের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই অগ্রগতি সূচিত করে। অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হলো সম্পূর্ণভাবে বৈপ্লবিক ও সৃজনশীল। '*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে মার্ক্স দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে মানবসমাজ ও ইতিহাসের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা হেগেল ও ফয়েরবাখের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়নি। কারণ ফয়েরবাখ 'মানুষ'কে ইতিহাসের ফল হিসেবে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফয়েরবাখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হিসেবে জগতের ধারণাকে একদিকে শুধুমাত্র চিন্তা বা ধ্যান বা প্রত্যাশার (contemplation) বিষয়, আবার অন্যদিকে শুধুমাত্র অনুভবের বিষয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি 'প্রকৃত ঐতিহাসিক মানুষের' পরিবর্তে 'মানুষ'

---

[1] When socialist writers ascribe this world-historic role to the proletariat, it is not at all, as Critical Criticism pretends to believe, because they regard the proletarians as *gods*. Rather the contrary. Since in the fully-formed proletariat the abstraction of all humanity, even of the *semblance* of humanity, is practically complete; since the conditions of life of the proletariat sum up all the conditions of life of society today in their most inhuman form; since man has lost himself in the proletariat, yet at the same time has not only gained theoretical consciousness of that loss, but through urgent, no longer removable, no longer disguisable, absolutely imperative *need* -- the practical expression of *necessity* -- is driven directly to revolt against this inhumanity, it follows that the proletariat can and must emancipate itself. Marx and Engels, *The Holy Family, or Critique of Critical Criticism. Against Bruno Bauer and Company,* Translated by Richard Dixon and Clemens Dutt, *op. cit.,* p. 47.

কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি 'মানুষ' বলতে 'জার্মান মানুষ'কে বুঝিয়েছেন। তিনি অপরিহার্যভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক ধারণার চিন্তা বা ধ্যান বা প্রত্যাশার (contemplation) দিকে, যা তাঁর চেতনা ও অনুভবের সঙ্গে খাপ খায় না। চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ কেন সরাসরি অসীম থেকে পাওয়া যুগের পর যুগ ধরে একই রকম নয়? –এই বিষয়টি ফয়েরবাখের চিন্তাধারায় ধরা পড়েনি। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর মতে, চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হলো শিল্পোৎপাদন ও সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফসল। অর্থাৎ, চারপাশের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হলো একটি ইতিহাসের ফসল ও সমগ্র প্রজন্ম পরম্পরায় কর্মতৎপরতার ফল, যার প্রত্যেকটি পূর্ববর্তীকালের অর্জনের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকা শিল্পোৎপাদনের বিকাশ, বিনিময় সম্পর্কিত মানুষের সম্পর্কের বিকাশ এবং পরিবর্তিত চাহিদার ধরন অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিশ্চিত বিষয় বলে যা উপস্থিত হয় (sensuous certainty), তাও সমাজ বিকাশের অভ্যন্তর থেকে, শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যিক বা বিনিময় সম্পর্কের মধ্যে তৈরি হওয়া জগৎ থেকেই প্রাপ্ত।[১]

মার্ক্স এবং এঙ্গেলস-এর মতে, প্রকৃতির সাথে মানুষের ঐক্য সবসময়ই বিভিন্নরূপে প্রত্যেক কালপর্বে শিল্পোৎপাদনের বিকাশ অনুসারে কম বা বেশি শিল্পোৎপাদনে ছিল এবং আছে। মানুষের সাথে প্রকৃতির সংগ্রাম যেভাবে চলছে, সেই একইভাবে প্রতিনিয়ত এর অনুরূপ স্তর অনুসারে তার উৎপাদন ক্ষমতারও বিকাশ চলছে। শিল্প এবং বাণিজ্য, উৎপাদন ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিময় মানুষ নিজেই নির্ধারণ করে। যেমন, বিতরণ ব্যবস্থা কেমন হবে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর গঠন কাঠামো কেমন হবে, কোন ধরনের উৎপাদন পদ্ধতিতে তারা

---

[1] Feuerbach's "conception" of the sensuous world is confined on the one hand to mere contemplation of it, and on the other to mere feeling; he says "Man" instead of "real historical man." "Man" is really "the German." In the first case, the contemplation of the sensuous world, he necessarily lights on things which contradict his consciousness and feeling, which disturb the harmony he presupposes, the harmony of all parts of the sensuous world and especially of man and nature. ... He does not see how the sensuous world around him is, not a thing given direct from all eternity, remaining ever the same, but the product of industry and of the state of society; and, indeed, in the sense that it is an historical product, the result of the activity of a whole succession of generations, each standing on the shoulders of the preceding one, developing its industry and its intercourse, modifying its social system according to the changed needs. Karl Marx and Frederich Engels, *The German Ideology,* Marx Engels Collected Works, Vol-5, *op. cit.,* p. 39.

Dhaka University Institutional Repository

চলবে — তাও মানুষই নির্ধারণ করবে। কিন্তু মানুষের ইতিহাস শুরুর আগে যে প্রকৃতি ছিল, সেই প্রকৃতিতে কোন অর্থেই ফয়েরবাখ বসবাস করতে পারেনি বলে মার্ক্স ও এঙ্গেলস মনে করেন।

মার্ক্স '*A Contribution to the Critique of Political Economy*' (1859) গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ কতকগুলো অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে তথা উৎপাদন-সম্পর্কে জড়িত হয়, যা মানুষের বাস্তব উৎপাদন শক্তি বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদন-সম্পর্কগুলোর সমষ্টি হলো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো। এই অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিসৌধ (superstructure) গড়ে উঠে। মানব জীবনের সামাজিক উৎপাদনে ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে, যাকে উৎপাদন সম্পর্ক বলা হয়। উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টিই তৈরি করে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, যার উপর গড়ে উঠে উপরিসৌধ (superstructure)। এই উপরিসৌধের মধ্যে রয়েছে শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও রাজনীতি ইত্যাদি। উৎপাদন পদ্ধতি উপরিসৌধের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ বস্তুগত জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের চেতনা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং মানুষের সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্ক্স-এর মতে, বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাজের উৎপাদন শক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কগুলোর বিরোধ ঘটে। উৎপাদন শক্তির বিকাশের বিভিন্ন রূপ থেকে এই সম্পর্কগুলোই পরিবর্তিত হয়ে উৎপাদন শক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরিসৌধও (superstructure) কমবেশি দ্রুত রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। এই রূপান্তর ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। **প্রথমত,** উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব রূপান্তর — যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো অনিবার্য নিয়মমাফিক বলে জানা যায়। **দ্বিতীয়ত,** মানুষের চিন্তাধারার স্বরূপ — আইন, রাজনীতি, ধর্ম, নন্দনতত্ত্ব বা দর্শন — যার মাধ্যমে মানুষ এই বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং বিরোধ নিরসনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কোন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে কী ভাবে? এবং এই ভাবনার উপর নির্ভর করে যেমন তার সম্পর্কে কোন মত স্থির করা চলে না, তেমনি পরিবর্তনের কোন যুগকে তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করা যায় না। বরং সে যুগের চেতনাকে ব্যাখ্যা ও বিচার করতে হবে বাস্তব জীবনের স্ববিরোধিতা দিয়ে এবং সামাজিক উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার সংঘর্ষ দিয়ে। উৎপাদন শক্তি বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক সংগতিপূর্ণভাবে

গড়ে তোলে। মার্ক্স-এর মতে, উৎপাদন শক্তি বলতে অবশ্যই কোন একটি উপযোগী মূর্ত শ্রমকে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদিত যে কোন উৎপাদনশীল কর্মের কার্যকারিতা নির্ভর করে তার উৎপাদন শক্তির উপর। অর্থাৎ উৎপাদন শক্তি হলো শ্রমের একটি নির্দিষ্ট উপযোগী রূপ। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স বলেন,

> Productive power has reference, of course, only to labour of some useful concrete form, the efficacy of any special productive activity during a given time being dependent on its productiveness. ... On the other hand, no change in this productiveness affects the labour represented by value. Since productive power is an attribute of the concrete useful forms of labour, of course it can no longer have any bearing on that labour, so soon as we make abstraction from those concrete useful forms.[১]

উৎপাদন শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোন বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে না। পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থার গর্ভে নতুন ব্যবস্থার অস্তিত্বের উপযোগী অবস্থা পূর্ণতা লাভ করার মাধ্যমেই উৎপাদনের উচ্চতর নতুন সম্পর্কগুলোর আবির্ভাব হতে পারে। আর মানবজাতি সর্বদাই সেই জটিল কাজের ভার গ্রহণ করে যে জটিল কাজের সমাধান সে করতে পারে। কাজেই কোন একটি কর্তব্য তখনই আমাদের সামনে হাজির হয় যখন কর্তব্য সমাধান করার পক্ষে অনুকূল বাস্তব অবস্থা উদ্ভূত হয় কিংবা তা গড়ে উঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিতে এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতিগুলোকে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা গঠনের ক্রমিক অগ্রসরমান পর্যায় বলা যায় বলে মার্ক্স মনে করেন। উৎপাদন সম্পর্কগুলো হলো সামাজিক উৎপাদন প্রণালীর শেষ বৈরিভাবাপন্ন অবস্থা। ব্যক্তিমানুষের জীবনযাত্রার সামাজিক অবস্থার মধ্য থেকে বৈরিভাবের উদ্ভব হয়। আর বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদনশক্তিসমূহ সেই বৈরিভাব সমাধানের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে। মার্ক্স তাঁর '*A Contribution to the Critique of Political Economy*' (1859) গ্রন্থের মুখবন্ধে (Preface) বলেন,

---

[১] Karl Marx, *Capital*, Volume One, Marx Engels Collected Works, Vol-35, *op. cit.,* p. 56.

> No social order is ever destroyed before all the productive forces for which it is sufficient have been developed, and new superior relations of production never replace older ones before the material conditions for their existence have matured within the framework of the old society. ... In broad outline, the Asiatic, ancient, feudal and modern bourgeois modes of production may be designated as epochs marking progress in the economic development of society. The bourgeois mode of production is the last antagonistic form of the social process of production – antagonistic not in the sense of individual antagonism but of an antagonism that emanates from the individuals' social conditions of existence – but the productive forces developing within bourgeois society create also the material conditions for a solution of this antagonism. The prehistory of human society accordingly closes with this social formation.[১]

মার্ক্স তাঁর '*The Poverty of Philosophy*' (1847) গ্রন্থে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করেন। তাঁর মতে, সামাজিক সম্পর্কের সাথে উৎপাদন শক্তির একটি যোগসূত্র আছে। মানুষ নতুন উৎপাদন শক্তি অর্জন করলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করে। উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জীবিকা উপার্জনের উপায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমগ্র সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। হাতে যন্ত্র চালানোর সময় মানুষ সামন্ততান্ত্রিক যুগের বাসিন্দা ছিল। এই যন্ত্রই যখন বাষ্পে চালিত হলো তখন মানুষ শিল্পসংক্রান্ত পুঁজিবাদী সমাজের বাসিন্দায় পরিণত হলো। কাজেই

---

[১] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, (Moscow : Progress Publishers, , 1977), pp. 21-22

উৎপাদন শক্তির নিরবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে চলেছে।[১]

১৮৪৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্যারিসে পি. ভি. আন্নেন্‌কভ (P.V. Annenkov)-এর কাছে লিখিত চিঠিতে মার্ক্স বলেছেন, সমাজের রূপ যাই হোক না কেন, সমাজ হলো মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল। মানুষের উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটি বিশেষ অবস্থার কথা যদি ধরা যায় তাহলে বাণিজ্য ও পণ্যভোগের অনুরূপ একটি রূপের কথা এসে যাবে। উৎপাদন, বাণিজ্য ও পণ্যভোগের এক বিশেষ পর্যায়ের কথা ধরে নিলেই এসে যাবে সামাজিক গঠনের একটি তদনুযায়ী প্রথা, পরিবার, বর্গ বা শ্রেণী সংগঠনের একটি তদনুযায়ী রূপ, এক কথায় একটি তদনুযায়ী নাগরিক সমাজ। একটি বিশেষ নাগরিক সমাজ ধরে নিলেই এসে যাবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা। মানুষের সমস্ত ইতিহাসের যা ভিত্তি সেই নিজের উৎপাদন-শক্তিনিচয়ের স্বাধীন নিয়ন্তা মানুষ নয়, কারণ উৎপাদন-শক্তি মাত্রই অর্জিত শক্তি, প্রাক্তন ক্রিয়ার ফল। কাজেই উৎপাদন-শক্তি হলো মানুষের ব্যবহারিক উদ্যোগের ফল। প্রত্যেক পরবর্তী পুরুষ পূর্ববর্তী পুরুষের অর্জিত উৎপাদন শক্তিসমূহের অধিকারী হয় এবং তাদের জন্য সেগুলো নতুন উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। তাই নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির উৎপাদন শক্তি অত্যন্ত চলনশীল। উৎপাদন শক্তি সদা গতিশীল থাকে এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলোর চেয়ে উৎপাদন শক্তি দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়। অর্থাৎ উৎপাদন সম্পর্কগুলো উৎপাদন শক্তিগুলোর পিছনে পড়ে থাকে এবং উৎপাদন শক্তির বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে এ দুইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। নতুন উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক উচ্ছেদ করার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের শেষ হয়। মার্ক্স-এর মতে, যে অর্থনৈতিক রূপগুলোর মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন, ভোগ ও বিনিময় করে

---

[১] Social relations are closely bound up with productive forces. In acquiring new productive forces men change their mode of production; and in changing their mode of production, in changing the way of earning their living, they change all their social relations. The hand-mill gives you society with the feudal lord; the steam-mill, society with the industrial capitalist. The same men who establish their social relations in conformity with the material productivity, produce also principles, ideas, and categories, in conformity with their social relations. Thus the ideas, these categories, are as little eternal as the relations they express. They are *historical and transitory products*. T. Borodulina (Complited), K. Marx F. Engels V. Lenin, *On Historical Materialism : A Collection,* (Moscow : Progress Publishers, 1972), p. 77

সেগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ঐতিহাসিক। নতুন উৎপাদন-শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে এবং উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ককেও পরিবর্তন করে। মানুষের উৎপাদন-শক্তি যতই বিকাশ লাভ করতে থাকে ততই পরস্পরের সাথে তাদের কতকগুলো সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে এবং উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবীরূপে এই সম্পর্কগুলোর প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়।[১]

১.১.৩ এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্ক্স-এর নিজস্ব চিন্তাধারার ফসল–এ কথা এঙ্গেলস তাঁর বিভিন্ন রচনায় বহুবার স্বীকার করেছেন। মার্ক্স-এর নিজস্ব চিন্তাধারা ও রচনা ছাড়াও মার্ক্স এঙ্গেলস-এর যৌথ রচনায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মার্ক্স-এর জীবদ্দশায় ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে এবং এইসমস্ত আলোচনা ও সমালোচনার জবাব মার্ক্স বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। বিশেষ করে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of*

---

[১] The product of men's reciprocal action. ... Assume a particular state of development in the productive faculties of man and you will get a particular form of commerce and consumption. Assume particular stages of development in the production, commerce and consumption and you will have a corresponding social constitution, a corresponding organisation of the family, of orders or of classes, in a word, a corresponding civil society. ... The productive forces are therefore the result of practical human energy; but this energy is itself conditioned by the circumstances in which men find themselves, by the productive forces already acquired, by social form which exists before they do, which they do not create, which is the product of the preceding generation. ... Thus the economic forms in which men produce, consume and exchange, are transitory and historical. With the acquisition of new productive faculties, men change their mode of production and with the mode of production all the economic relations which are merely the necessary relations of this particular mode of production. Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* pp. 518 -519.

the Communist Party' (1847-1848) নামক পুস্তিকায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমালোচনার জবাব দিয়েছেন। কিন্তু ১৮৮৩ সালে মার্ক্স-এর মৃত্যুর পর 'কার্ল মার্ক্স-এর সমাধিপার্শ্বে ভাষণে এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্ক্স-এর চিন্তাধারাকে অতি অল্প কথায় ব্যাখ্যা করেন। ১৮৮৩ সালের ১৭ মার্চ লন্ডনের (London) হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে (Highgate Cemetery) এঙ্গেলস তাঁর *Speech at the Graveside of Karl Marx* শিরোনামে ভাষণটিতে উল্লেখ করেন, ডারউইন যেমন জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন তেমনি মার্ক্স আবিষ্কার করেছেন মানুষের ইতিহাসের বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়ম, মতাদর্শের অতি নিচে এতদিন লুকিয়ে রাখা এই সহজ সত্য যে, রাজনীতি, বিজ্ঞান, কলা, ধর্ম ইত্যাদি চর্চা করার আগে মানুষের প্রথম প্রয়োজন হলো খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, পরিচ্ছেদ। কাজেই জীবনধারণের আশু বাস্তব উপকরণের উপাদান এবং সেইহেতু কোন নির্দিষ্ট জাতির বা নির্দিষ্ট যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রাই হলো সেই ভিত্তি, যার উপর গড়ে উঠে সংশ্লিষ্ট জাতির রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইনের ধারণা, শিল্পকলা, এমনকি তাদের ধর্মীয় ভাবধারা পর্যন্ত এবং সেই দিক থেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি যে বুর্জোয়া সমাজ সৃষ্টি করেছে তার গতির বিশেষ নিয়মটিও মার্ক্স আবিষ্কার করেন। মার্ক্স-এর কাছে বিজ্ঞান হলো এক ঐতিহাসিকভাবে গতিষ্ণু বিপ্লবী শক্তি। কোন একটি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের কল্পনা করাকে স্বাগত জানালেও তিনি সম্পূর্ণরূপে আনন্দ পেতেন কোন আবিষ্কার শিল্পে এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিক বিকাশে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলে। প্রকৃতপক্ষে মার্ক্স ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর জীবনের আসল ব্রত ছিল পুঁজিবাদী সমাজ এবং এই সমাজ যেসমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তার উচ্ছেদ করা, আধুনিক প্রলেতারিয়েতের মুক্তিসাধনের কাজে অংশগ্রহণ করা। তিনিই প্রথম প্রলেতারিয়েতের

নিজের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে এবং তার মুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিলেন।[১]

এঙ্গেলস তাঁর '*Anti-Dühring*' (1978) গ্রন্থে বলেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধরাণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং উদ্বৃত্তমূল্যই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চাবিকাঠি। এ দুটি ঐতিহাসিক আবিষ্কারের জন্য মানবজাতি মার্ক্স-এর কাছে ঋণী। এর ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। এঙ্গেলস বলেন,

> These two great discoveries, the materialistic conception of history and the revelation of the secret of capitalistic production through surplus-value, we owe to *Marx.* With these discoveries socialism became a science. The next thing was to work out all its details and relations.[২]

এঙ্গেলস তাঁর '*Socialism : Utopian and Scientific*' গ্রন্থে ১৮৯২ সালের ইংরেজি সংস্করণের জন্য বিশেষ ভূমিকা ছাড়াও উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ'

---

[১] Just as Darwin discovered the law of development or organic nature, so Marx discovered the law of development of human history: the simple fact, hitherto concealed by an overgrowth of ideology, that mankind must first of all eat, drink, have shelter and clothing, before it can pursue politics, science, art, religion, etc.; that therefore the production of the immediate material means, and consequently the degree of economic development attained by a given people or during a given epoch, form the foundation upon which the state institutions, the legal conceptions, art, and even the ideas on religion, of the people concerned have been evolved, and in the light of which they must, therefore, be explained, instead of vice versa, as had hitherto been the case. But that is not all. Marx also discovered the special law of motion governing the present-day capitalist mode of production, and the bourgeois society that this mode of production has created. ... For Marx was before all else a revolutionist. His real mission in life was to contribute, in one way or another, to the overthrow of capitalist society and of the state institutions which it had brought into being, to contribute to the liberation of the modern proletariat, which he was the first to make conscious of its own position and its needs, conscious of the conditions of its emancipation. Fighting was his element. And he fought with a passion, a tenacity and a success such as few could rival. Frederick Engels, *Speech at the Graveside of Karl Marx*, Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* pp. 162 -163.

[২] Frederick Engels, *Anti-Dühring*, Foreign Language Press, Peking, 1976, p. 34.

সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এঙ্গেলস-এর মতে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে মানব জীবনের ভরণপোষণের উপায়ের উৎপাদন এবং উৎপাদনের পর উৎপাদিত বস্তুর বিনিময় ব্যবস্থা হলো সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি। ইতিহাসে আবির্ভূত প্রতিটি সমাজের সম্পদ বণ্টনের ধরন এবং শ্রেণী ও বর্গে কী উৎপাদন হলো, কীভাবে উৎপাদন হলো এবং কীভাবে উৎপাদিত পণ্যের বিনিময় হলো তার উপর সমাজ কাঠামোর ভিত্তি নির্ভরশীল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের শেষ কারণ অনুসন্ধান করতে হবে উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে। অর্থাৎ, প্রতিটি যুগের সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে অর্থনীতির মধ্যে বলে এঙ্গেলস মনে করেন। এঙ্গেলস-এর মতে, সমাজের বর্তমান অবস্থা আজকের শাসকশ্রেণী হলো বুর্জোয়ার সৃষ্টি। বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের কাঠামো ভেঙে তার ধ্বংসের উপর নির্মাণ করেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, — অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের চোখে সমস্ত পণ্য-মালিকদের সমান অধিকার ইত্যাদি হলো পুঁজিবাদী আর্শীবাদের রাজত্ব। তখন থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। যখন পুরনো কারখানাকে আধুনিক শিল্পে রূপান্তরিত করা হলো তখন থেকেই বুর্জোয়াদের পরিচালনায় উৎপাদন-শক্তি দ্রুত গতিতে ও দ্রুত মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। উৎপাদন-শক্তিকে ব্যবহার করার যে পুঁজিবাদী ধরন তাকে ইতোমধ্যে ছাড়িয়ে গেছে নতুন উৎপাদন-শক্তিতে। ফলে উৎপাদন-শক্তির সাথে উৎপাদন পদ্ধতির সংঘাত সৃষ্টি হয়।[১]

---

[১] The materialist conception of history starts from the proposition that the production of the means to support human life and, next to production, the exchange of things produced, is the basis of all social structure; that in every society that has appeared in history, the manner in which wealth is distributed and society divided into classes or orders is dependent upon what is produced, how it is produced, and how the products are exchanged. From this point of view, the final causes of all social changes and political revolutions are to be sought, not in men's brains, not in men's better insights into eternal truth and justice, but in changes in the modes of production and exchange. ... And this conflict between productive forces and modes of production is not a conflict engendered in the mind of man, like that between original sin and divine justice. Frederick Engels, *Socialism : Utopian and Scientific,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,*pp. 133-134.

এঙ্গেলস তাঁর '*Origins of the Family, Private Property, and the State*' (1884) গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী ইতিহাসের নির্ধারক করণিকা হলো প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। কিন্তু এই বিষয়টির প্রকৃতি হলো দুই ধরনের। যথা:

১। জীবনযাত্রার উপকরণ; যেমন- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং সেইজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন, যাকে এঙ্গেলস শ্রমের বিকাশের স্তর বলেছেন।

২। মানবজাতির জৈবিক উৎপাদন তথা বংশবৃদ্ধি, যাকে এঙ্গেলস পারিবারিক বিকাশের স্তর বলেছেন।

এঙ্গেলস-এর মতে, একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে একটি বিশেষ দেশে মানুষ যেসকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসবাস করে সেগুলো এই দুই ধরনের উৎপাদনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তিনি বলেন, শ্রমের বিকাশ যত কম হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ এবং এ কারণে সমাজের সম্পদ যত সীমাবদ্ধ হয়, সমাজব্যবস্থা তত বেশি জ্ঞাতিসম্পর্ক (kinship) দিয়ে পরিচালিত হয়। কিন্তু জ্ঞাতিসম্পর্ক (kinship) বা বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত এই সমাজ কাঠামোর মধ্যে শ্রমের উৎপাদন-শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিনিময় ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে। সম্পদের অসাম্য, অপরের শ্রমশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা এবং তার ফলে শ্রেণী-বিরোধের ভিত্তি ও নতুন সামাজিক উপাদানগুলো কয়েক পুরুষ ধরে পুরাতন সামাজিক সংগঠনকে নতুন অবস্থানগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে, অবশেষে উভয়ের এই গরমিল থেকে আসে পরিপূর্ণ বিপ্লব। জ্ঞাতিসম্পর্ক (kinship) বা বন্ধনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা পুরাতন সমাজ নতুন সামাজিক শ্রেণীগুলোর সংঘাতে চুরমার হয়ে যায়। তার জায়গায় দেখা দেয় রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত নতুন একটি সমাজ ব্যবস্থা। এ ধরনের সমাজে পারিবারিক প্রথা এবং জ্ঞাতিত্ব মালিকানা প্রথার অধীন যে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রাম এযাবৎকালের

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত লিখিত ইতিহাসের মর্মবস্তু সেটি তার মধ্যে অবাধে বিকাশ লাভ করে।[১]

এঙ্গেলস তাঁর '*Origins of the Family, Private Property, and the State*' (1884) গ্রন্থটিতে সংস্কৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তর বিশেষ করে বন্যাবস্থা ও বর্বরতা (Savagery and Barbarism), পরিবার (Family), পরিবারের শ্রেণী-বিভাগ, পরিবার সম্পর্কে মর্গানের (Lewis Henry Morgan) বিশ্লেষণ, বিবাহ (marriage), জ্ঞাতিসম্পর্ক (kinship), ইরকোয়াস গোত্র-সংগঠন[২] (The Iroquois Gens), গ্রিক গোত্র-সংগঠন, এথেনীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রোমের গোত্র ও সংগঠন, কেল্টিক ও জার্মানদের মধ্যে গোত্র (The Gens among Celts and Germans), জার্মানদের মধ্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং শেষে বর্বরতা ও সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর

---

[১] According to the materialistic conception, the determining factor in history is, in the final instance, the production and reproduction of the immediate essentials of life. ... The social organization under which the people of a particular historical epoch and a particular country live is determined by both kinds of production: by the stage of development of labor on the one hand and of the family on the other. ... In the collision of the newly-developed social classes, the old society founded on kinship groups is broken up; in its place appears a new society, with its control centered in the state, the subordinate units of which are no longer kinship associations, but local associations; a society in which the system of the family is completely dominated by the system of property, and in which there now freely develop those class antagonisms and class struggles that have hitherto formed the content of all *written* history. Frederick Engels, *Origins of the Family, Private Property, and the State,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* pp. 191-192.

[২] যেসমস্ত লোক পুনালুয়া (Punaluan) বিবাহের (আপন ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে পুনালুয়ান পরিবারের উৎপত্তি। এটি মূলত একটা দলগত বিবাহের নিদর্শন। এ পর্যায়ে একদল ভাই আপন বা জ্ঞাতি সম্পর্কীয় একদল মেয়েকে বিবাহ করে পুনালুয়ান পরিবার গঠন করে। অপরপক্ষে একদল মেয়ে কোন কোন একদল পুরুষকে বিবাহ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে স্বামীরা পরস্পর ভাই হলে স্ত্রীরা পরস্পর বোন নয়।) ফলে এবং অনিবার্যভাবে সেখানে প্রাধান্য বিস্তাকারী ধারণা অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বিশিষ্ট মাতার গোত্র-প্রতিষ্ঠাত্রীর বংশরূপে পরিগণিত তাদের নিয়ে ইরকোয়াস গোত্র সংগঠন গড়ে উঠে। ইরকোয়াসদের মধ্যে মাতৃ অধিকার প্রচলিত ছিল। যেহেতু ভাইয়েরা নিজেদের বোনদের বিবাহ করতে পারে না এবং অন্য বংশের মেয়েদের বিবাহ করতে হয় সেহেতু এই শেষোক্ত মেয়েদের ছেলেমেয়েরা মাতৃ অধিকার অনুসারে গোত্রের বাইরে পড়ে। কাজেই প্রত্যেক পুরুষের শুধু কন্যাদের ছেলেমেয়েরাই আত্মীয়মণ্ডলীর (kinship) মধ্যে থেকে যায় এবং ছেলেদের সন্তানরা তাদের মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব, একই উপজাতির মধ্যে অনুরূপ ধরনের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে যে রক্তসম্পর্কযুক্ত (kinship) গোষ্ঠীটি পৃথক হয়ে যায় তারাই হলো ইরকোয়াস গোত্র-সংগঠন। মর্গান এই আদি গোত্রের চিরায়তরূপ হিসেবে ইরকোয়াস গোত্র বিশেষ করে সেনেকা উপজাতির গোত্রকে ধরেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, Frederick Engels, *Origins of the Family, Private Property, and the State,* Karl Marx and Fredric Engels Collected Works, Volume 26, *op. cit.,* pp. 190-195.)

নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলো পরিবার, গোষ্ঠী, শ্রেণী ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির উৎস এবং এসব প্রতিষ্ঠান বিকাশের বাস্তব নিয়মবদ্ধতা ও শেষে উৎপাদনের বৈষয়িক পদ্ধতির উপর এসব প্রতিষ্ঠানের নির্ভরতা রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কেন অনিবার্যভাবেই কতকগুলো সামাজিক রূপে জায়গায় জন্ম নেয় অন্য কোন নতুন সামাজিক রূপ।[১]

এঙ্গেলস তাঁর '*Origins of the Family, Private Property, and the State*' (1884) গ্রন্থটিতে বলেন, যেহেতু শ্রেণী-বিরোধের মধ্যেই এবং শ্রেণী-বিরোধকে সংযত করার প্রয়োজনবোধ থেকে রাষ্ট্রের আবির্ভাব সেহেতু রাষ্ট্র হলো সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূতকারী শ্রেণীর রাষ্ট্র। এই শ্রেণী রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণী হয়ে উঠে এবং তার ফলে নিপীড়িত শ্রেণীর দমন এবং তার শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এভাবে প্রাচীন যুগের রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাসদের দমনের জন্য দাস মালিকদের রাষ্ট্র। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হলো পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার। তাঁর মতে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার স্থির হয় ধন সম্পদের অনুপাতে। কাজেই রাষ্ট্র হলো বিত্তহীন শ্রেণীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিত্তশীল শ্রেণীর একটি সংগঠন। সম্পত্তির ভিত্তিতে এথেনীয় ও রোমকদের বর্গবিভাগের ক্ষেত্রে ছিল, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টন ছিল মালিকানাধীন জমির পরিমাণ অনুসারে। আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রের ভোটাধিকার যোগ্যতার মধ্যে এই বিষয়টি দেখা যায় বলে এঙ্গেলস মনে করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রূপ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, আমাদের সমাজের আধুনিক অবস্থায় যে রূপটি ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং যে রাষ্ট্র রূপের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণী ও

[১] বিস্তারিত দেখুন, কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস *রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড,* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০), পৃ. ৯-১০।

বুর্জোয়াশ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চলতে পারে, সেই গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পত্তিভেদ নেই।[১]

এঙ্গেলস-এর একটি বিশ্ববিখ্যাত এবং অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হলো '*Anti-Dühring*' (1978)। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস তাঁর সমকালীন এক জার্মান লেখক ও অধ্যাপক ইউজেন ডুরিং (Eugen Dühring)-এর ভ্রান্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করেছেন। '*Anti-Dühring*' গ্রন্থটির পটভূমি হলো উনিশ শতকের ইউরোপীয় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং মার্ক্স-এর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ। এই গ্রন্থে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্র (socialism) বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক দিক, সমাজতন্ত্রের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র, পরিবার ও শিক্ষা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। এঙ্গেলস-এর মতে, মানুষের আদিম অবস্থার পর থেকে সমগ্র ইতিহাসই হলো শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। সমাজের সংগ্রামরত শ্রেণীগুলো উৎপাদনের সম্পর্ক এবং বিনিময় ব্যবস্থার উৎপাদিত ফল। অর্থাৎ, প্রতিটি যুগের শ্রেণী সংগ্রাম হলো অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হলো যে কোন সমাজের মূল ভিত্তি। এই মূল ভিত্তি থেকে আইন, রাষ্ট্রীয় শাসন, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দর্শন এবং একটি ঐতিহাসিক যুগের বাকি সকল ধ্যান–ধারণা উৎসারিত হয়। এঙ্গেলস বলেন,

> The new facts made imperative a new examination of all past history. Then it was seen that *all* past history [, with the exception of its primitive stage,] was the history of class struggles; that these social classes warring with each other are always the products of the relations of production and of exchange — in a word, of the *economic* relations of their epoch; that therefore the economic structure of society

[১] The ancient state was, above all, the state of the slave-owners for holding down the slaves, just as the feudal state was the organ of the nobility for holding down the peasant serfs and bondsmen, and the modern representative state is the instrument for exploiting wage-labor by capital. ... Further, in most historical states the rights conceded to citizens are graded on a property basis, whereby it is directly admitted that the state is an organization for the protection of the possessing class against the non-possessing class. Frederick Engels, *Origins of the Family, Private Property, and the State,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* pp. 328-329.

> always forms the real basis, from which, in the last analysis, the whole superstructure of legal and political institutions as well as of the religious, philosophical, and other ideas of a given historical period is to be explained. ... But now idealism was driven from its last refuge, the conception of history; now a materialistic treatment of history was advanced, and the way found to explain man's consciousness by his being, as heretofore, his being by his consciousness.[১]

এঙ্গেলস-এর মতে, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে সমস্ত সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হলো উৎপাদন ব্যবস্থা এবং পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা। ইতিহাসের প্রতিটি সমাজব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে সামাজিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল এবং নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে তা বিকাশ লাভ করে। উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই হলো এই পদ্ধতি সদা পরিবর্তনশীল ও সদা বিকাশমান। উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও বিকাশ শুরু হয়। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তনের পর শুরু হয় উৎপাদন সম্পর্কগুলোর পরিবর্তন, যা পরিচালিত করে সমস্ত সামাজিক ধারণা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যার দ্বারা গঠিত হয় সামাজিক উপরিসৌধ (superstructure)। রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক, শিল্পগত ইত্যাদির বিকাশ ঘটে অর্থনৈতিক বিকাশকে ভিত্তি করে। এদের সবগুলোই পরস্পরের উপর এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও ক্রিয়া করে। এঙ্গেলস বলেন,

> The materialist conception of history starts from the proposition that the production and, next to production, the exchange of things produced, is the basis of all social structure; that in every society that has appeared in history, the manner in which wealth is distributed and society divided into classes or estates is dependent upon what is produced, how it is produced, and how the products are exchanged. From this point of view the final causes of all social changes and political revolutions are to be sought, not in men's brains,

[১] Frederick Engels, *op. cit.,* 1976, pp. 32-33.

> not in man's better insight into eternal truth and justice, but in changes in the modes of production and exchange. ...but *discovered* with the aid of the head in the existing material facts of production.[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা সম্পর্কে কানিসবার্গ (Kunigsberg)-এর জে. ব্লক (J. Bloch) সমীপে এঙ্গেলস একটি পত্রে (লন্ডন, ২১/২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০) উল্লেখ করেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত নির্ধারক বস্তু। কেউ যদি তাকে বিকৃত করে বলে যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই হচ্ছে একমাত্র নির্ধারক বস্তু, তাহলে সে প্রতিপাদ্যটিকে একটি অর্থহীন, অমূর্ত, নির্বোধ উক্তিতে পরিণত করে। এঙ্গেলস বলেন,

> ... According to the materialist conception of history, the ultimately determining element in history is the production and reproduction of real life. More than this neither Marx nor I have ever asserted. Hence if somebody twists this into saying that the economic element is the only determining one, he transforms that proposition into a meaningless, abstract, senseless phrase.[২]

১.২ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঃ একটি সাধারণ আলোচনা

সমগ্র মানব সমাজ, মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা ও ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার বিশ্লেষণ করাই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজ জীবনের সামগ্রিক রূপ, সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়ম ও পরিচালিকা শক্তি নিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ আলোচনা করে। অর্থাৎ, সামাজিক চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্য এবং সমাজ জীবনে এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও গুরুত্বকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশেষভাবে স্বীকার করা হয়। তাছাড়া সমাজ জীবনে ও সমাজের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ধারার চিন্তা-চেতনাগুলোর

---

১ *Ibid.,* pp. 343-344.

২ Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* p. 487.

গুরুত্বের উপর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে বলেন, ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলকথা হলো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিতে নিয়োজিত থাকলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ব্যক্তির আচরণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে যে সিদ্ধান্তগুলো আসে তার পিছনে ভাববাদ বা কোন অলৌকিক ধারণা কাজ করে না। তাঁদের মতে, সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের উৎস হলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন প্রক্রিয়া। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে বলেন,

> The social structure and the State are continually evolving out of the life-process of definite individuals, however, of these individuals, not as they may appear in their own or other people's imagination, but as they actually are; i.e. as they act, produce materially, and hence as they work under definite material limits, presuppositions and conditions independent of their will.[১]

মার্ক্স-এর মতে, এই মানুষগুলো কোন কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা নয়। এই মানুষগুলো হলো পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত ব্যক্তি। এই উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি থেকেই চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, সচেতনতা ইত্যাদির উদ্ভব। অর্থাৎ প্রত্যেকটি চিন্তার একটি বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। শুধুমাত্র কল্পনা থেকে চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, সচেতনতা ইত্যাদির উদ্ভব হয় না। মানুষের সক্রিয় প্রচেষ্টা থেকেই চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, সচেতনতা তথা পরিবেশ তৈরি হয়। মার্ক্স বলেন, মানুষ নিজেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই বলে তার খেয়ালখুশিমতো সে ইতিহাস রচনা করতে পারে। যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি সে হয় সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়। মার্ক্স তাঁর '*The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*' (1852) গ্রন্থে বলেন,

---

[১] Karl Marx and Frederich Engels, *The German Ideology,* Marx Engels Collected Works, Vol-5, *op. cit.,* p. 35

> Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past. The tradition of all dead generations weighs like a nightmare on the brains of the living.[১]

এভাবে একটি প্রজন্ম যে পরিবেশ সৃষ্টি করে পরের প্রজন্ম সেই পরিবেশকে পরিবর্তন সাধন করে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিবেশই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

মার্ক্স-এর মতে, বাস্তব উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করার ক্ষমতার উপর ইতিহাসের ধারণা নির্ভর করে। এই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে জীবনের বস্তুগত উৎপাদন থেকে শুরু করে এবং বিনিময় সম্পর্কের রূপ ও উৎপাদন পদ্ধতির সামগ্রিক উপলব্ধি থেকে বুঝতে হবে। কারণ এই সামগ্রিক উপলব্ধিই হলো সমস্ত ইতিহাসের ভিত্তি। বাস্তব উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রাষ্ট্র, চেতনার স্বরূপ, দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদির উদ্ভব ও বিকাশ অনুসন্ধান করতে হয়। তাইতো আত্মসচেতনতাকে আত্মার আত্মা হিসেবে রূপান্তরিত করলেই ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে না। বরং ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই একটি বস্তুগত ফলাফল, উৎপাদন-শক্তিগুলোর সমষ্টি, প্রকৃতির সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—যা প্রত্যক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে। অর্থাৎ, উৎপাদন-শক্তি, সঞ্চিত পুঁজি ও শর্ত — প্রত্যক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করে একদিকে নতুন প্রজন্মের রূপান্তর ঘটিয়ে অন্যদিকে জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট বিকাশ ও বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে বলেন,

> ... It shows that history does not end by being resolved into "self-consciousness as spirit of the spirit", but that in it at each stage there is found a material result: a sum of productive forces, an historically created relation of

[১] Karl Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 398.

> individuals to nature and to one another, which is handed down to each generation from its predecessor; a mass of productive forces, capital funds and conditions, which, on the one hand, is indeed modified by the new generation, but also on the other prescribes for it its conditions of life and gives it a definite development, a special character. It shows that circumstances make men just as much as men make circumstances.[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে জীবনধারণের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার যে কৌশল তাই হলো সমাজের বস্তুগত জীবনব্যবস্থার শক্তি। অর্থাৎ বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন পদ্ধতিই হলো সমাজের বস্তুগত জীবন ব্যবস্থার শক্তি। উৎপাদন পদ্ধতি হলো উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের সমন্বিত রূপ। এই জন্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান কাজ হলো উৎপাদন পদ্ধতি বা প্রণালী–উৎপাদন শক্তি বিকাশের নিয়ম, উৎপাদন সম্পর্ক এবং সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলোর আলোচনা ও প্রকাশ করা।

মার্ক্স-এর মতে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের নিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে সমাজ গঠিত হয়নি। অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় সমাজ গঠিত হয়নি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান সূত্রটি হলো বাস্তব অস্তিত্বকে বজায় রাখার জন্য ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য ব্যক্তিকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হতে হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় উৎপাদন করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিকে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং এর ফলে সামাজিক জীবনের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ, একটি সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন ব্যবস্থায় ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। এভাবেই তৈরি হয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি। মানুষের সকল প্রকার উৎপাদন সম্পর্ক এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মিত হয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে মানুষের সচেতন শ্রমশক্তি কাজ করে। কারণ সামাজিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে

---

[১] Karl Marx and Fredrick Engels, *The German Ideology,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 42.

প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বস্তুবাদী উৎপাদন সম্ভব করার জন্য ব্যক্তির সচেতন শ্রমশক্তি অবশ্যই প্রয়োজন। একমাত্র মানুষের শ্রমই হলো সৃজনশীল শ্রমশক্তি। সৃজনশীল শ্রমশক্তির কারণে মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও সমাজকে বিকাশিত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের সৃজনশীল শ্রমশক্তি বস্তুবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে কার্যকর করে বলেই সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যেই সচেতনতা তৈরি হয়। সামাজিক অস্তিত্ব থেকেই নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই জন্যই সামাজিক অস্তিত্ব থেকে সামাজিক সচেতনতা জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ, সামাজিক অস্তিত্বই সামাজিক সচেতনতাকে নির্ধারণ করে। কেননা সামাজিক অস্তিত্ব না থাকলে সামাজিক সচেতনতা আসতে পারে না। মানুষ যেহেতু নিজের বাস্তব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার কাজে সবসময় নিয়োজিত থাকে সেহেতু সে তার সৃজনশীল শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করে। মানুষের নিজের শ্রমশক্তি ছাড়াও সঞ্চিত শ্রমশক্তি যেমন- উৎপাদন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকে। মানুষের সৃজনশীল শ্রমশক্তি, সঞ্চিত শ্রমশক্তি—সবকিছু একত্রিত হয়ে উৎপাদন শক্তি তৈরি হয়। আর উৎপাদনের জন্য উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন-শক্তি উভয়ই প্রয়োজন। এই উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন-শক্তির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সমাজ বিকাশ লাভ করে। মার্ক্স-এর মতে, মানুষের উৎপাদন-শক্তিতে কোন একটি পরিবর্তন অবশ্যসম্ভাবী উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন সূচনা করে। তিনি তাঁর '*The Poverty of Philosophy*' (1847) গ্রন্থে বলেন,

> Social relations are closely bound up with productive forces. In acquiring new productive forces men change their mode of production; and in changing their mode of production, in changing the way of earning their living, they change all their social relations.[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সামাজিক জীবন ও সামাজিক চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমাজের বস্তুগত জীবন ব্যবস্থার বিকাশ তথা সামাজিক জীবন ব্যবস্থার বিকাশ ও সামাজিক

---

[১] Karl Marx, *The Poverty of Philosophy*, K. Marx F. Engels V. Lenin, *On Historical Materialism : A Collection, op. cit.,* p. 77.

মননধারার বিকাশের সম্পর্কগুলোকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে J. V. Stalin তাঁর '*Dialectical and Historical Materialism*' নামক পুস্তিকায় বলেন,

> "As regards the significance of social ideas, theories, views and political institutions, as regards their role in history, historical materialism, far from denying them, stresses the important role and significance of these factors in the life of society, in its history."[১]

সমাজের বস্তুগত জীবন ব্যবস্থা হলো সমাজের পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি জগৎ ও ভৌগোলিক পরিবেশ, যা সমাজের বাস্তব জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় শর্ত এবং যা আবশ্যিকভাবে সমাজ বিকাশের ধারাকে প্রভাবিত করে। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ সমাজ বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক হলেও তা প্রধান শর্ত নয়। কারণ ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ও বিকাশ হয় মন্থর গতিতে আর সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশ হয় দ্রুত গতিতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইউরোপে তিন হাজার বছরের মধ্যে পর পর তিন ধরনের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বিকাশ লাভ করে। এই তিনটি সমাজ ব্যবস্থা হলো- আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা (the primitive communal system), দাসপ্রথা (the slave system) এবং সামন্তব্যবস্থা (the feudal system)। কিন্তু তিন হাজার বছরে ইউরোপের ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এইজন্যই সমাজ বিকাশে ভৌগোলিক পরিবেশ প্রধান শর্ত নয়।[২]

---

[১] J. V. Stalin, *Dialectical and Historical Materialism,* Kolkata, National Book Agency Private Ltd, 2007, p. 22.

[২] Geographical environment is unquestionably one of the constant and indispensable conditions of development of society and, of course, influences the development of society, accelerates or retards its development. ... Changes in geographical environment of any importance require millions of years, whereas a few hundred or a couple of thousand years are enough for even very important changes in the system of human society. *Ibid.,* pp. 25-26.

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক যোগসূত্রের ভিত্তিতে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ব্যাখ্যা করেন। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন যুগে উৎপাদন-শক্তির কিছু কিছু চরিত্রগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কেরও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কারণ ইতিহাসে সমাজের উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটেছে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন-শক্তির এই পরিবর্তন ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করে। নিচে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ককে একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো–

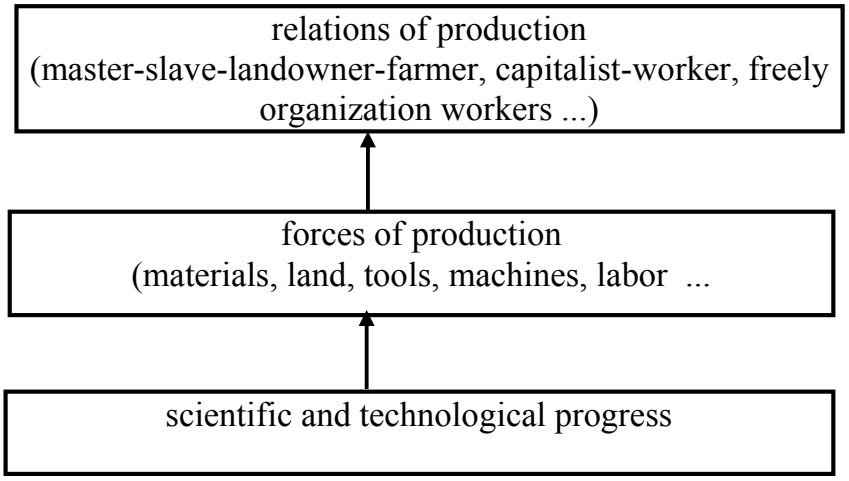

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে মার্ক্স উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of Production) ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, উৎপাদন পদ্ধতির (Mode of Production) দুটি দিক রয়েছে। যথা: ১। উৎপাদন-শক্তি এবং ২। উৎপাদন সম্পর্ক। মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং প্রকৃতির শক্তিকে বাস্তব কাজে ব্যবহার করে। কিন্তু এই সংগ্রাম মানুষ এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে করে না। এই সংগ্রাম করে দলবদ্ধভাবে বা সমাজবদ্ধভাবে। এইজন্যই সকল যুগে ও সকল অবস্থায় উৎপাদন বলতে সামাজিক উৎপাদন বুঝায়। এ প্রসঙ্গে স্তালিন (J. V. Stalin) বলেন,

> Men carry on a struggle against nature and utilize nature for the production of material values not in isolation from each other, not as separate individuals, but in common, in groups, in societies. Production, therefore, is at all times and under all conditions social production.[১]

বৈষয়িক বস্তু উৎপাদন করার জন্য মানুষকে পারস্পরিকভাবে কোন না কোন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। কারণ সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান হলো উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। কাজেই সমাজের বিকাশ ও পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে উৎপাদন শক্তিগুলোর সাথে উৎপাদন সম্পর্ক সংগতি বিধান করে চলে। মার্ক্স-এর মতে, উৎপাদনে মানুষের ক্রিয়া শুধু প্রকৃতির উপর নয়, বরং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ ধরনের সহযোগিতা এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া বিনিময় করেই মানুষ উৎপাদন করে। উৎপাদনের জন্য তারা পরস্পরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সব সামাজিক সংযোগ ও সম্পর্কের অভ্যন্তরেই ঘটে প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রিয়া তথা উৎপাদন। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স বলেন,

> In the process of production, human beings work not only upon nature, but also upon one another. They produce only by working together in a specified manner and reciprocally exchanging their activities. In order to produce, they enter into definite connections and relations to one another, and only within these social connections and relations does their influence upon nature operate – i.e., does production take place.[২]

উৎপাদন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদন পদ্ধতি দীর্ঘদিন একই জায়গায় থেমে থাকে না। মার্ক্স-এর মতে, যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষেরা উৎপাদন করে, উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়ের, উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবধরনের

---

১ J. V. Stalin, *Dialectical and Historical Materialism, Selected Works,,*Volume 1, Prometheus Publishing House, Kolkata, 2012, P. 246.

২ Karl Marx, *Wage Labour and Capital*, Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 159.

সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কগুলো পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। উৎপাদন সম্পর্কের সামগ্রিক রূপ নিয়েই সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সমাজ বলতে ঐতিহাসিকভাবে বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরের বা স্বকীয় বিশিষ্ট চরিত্রের সমাজকে বুঝায়। যেমন, আদিম সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, বুর্জোয়া সমাজ—এগুলোর প্রত্যেকটি উৎপাদন সম্পর্কগুলোর সমষ্টি, যার প্রত্যেকটি মানব ইতিহাসের বিকাশ ধারার এক একটি বিশেষ পর্যায় বা স্তর। মার্ক্স বলেন,

> We thus see that the social relations within which individuals produce, the social relations of production, are altered, transformed, with the change and development of the material means of production, of the forces of production. The relations of production in their totality constitute what is called the social relations, society, and, moreover, a society at a definite stage of historical development, a society with peculiar, distinctive characteristics. Ancient society, feudal society, bourgeois (or capitalist) society, are such totalities of relations of production, each of which denotes a particular stage of development in the history of mankind.[১]

উৎপাদন পদ্ধতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। এই পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আবশ্যিকভাবে পরিবর্তন ও বিকাশ লাভ করে। অর্থাৎ, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও বিকাশের কারণেই মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। যেমন- আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা, দাস সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন পদ্ধতি ও মানুষের জীবনযাত্রা ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কাজেই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও বিকাশের কারণেই মানুষের সমাজ ব্যবস্থা, ভাবাদর্শ, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়। এ প্রসঙ্গে স্তালিন (J. V. Stalin) তাঁর '*Dialectical and Historical Materialism*' নামক পুস্তিকায় বলেন,

---

[১] *Ibid.,* p. 160.

> Whatever is the mode of production of a society, such in the main is the society itself, its ideas and theories, its political views and institutions. ... This means that the history of development of society is above all the history of the development of production, the history of the modes of production which succeed each other in the course of centuries, the history of the development of productive forces and of people's relations of production.[১]

উৎপাদন পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদন শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ও বিকাশ শুরু হয়। কারণ উৎপাদন পদ্ধতির সবচেয়ে গতিশীল ও বিপ্লবী উপাদান হলো উৎপাদন-শক্তি। মানুষের জীবনধারণের জন্য সে সকল বস্তুর প্রয়োজন সেগুলোকে প্রকৃতি থেকে সরাসরি সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায় না। প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত সম্পদগুলোকে মানুষের শ্রমশক্তি ব্যবহারের ফলেই ভোগ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করা হয়। শ্রমশক্তির ব্যবহার ছাড়া প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ উৎপাদনের কাজে সাহায্য করে না। তবে কেবলমাত্র শ্রমশক্তিই প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদকে ভোগ্য বস্তুতে রূপান্তর ঘটাতে পারে না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতিরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কাজেই মানুষের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রপাতি-সবকিছুই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সম্ভব করে তোলে। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপকরণগুলো যেমন- উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি এবং মানুষের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাই হলো উৎপাদন শক্তি। অর্থাৎ, উৎপাদন শক্তি = শ্রমিকের শারীরিক শ্রম + উৎপাদনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি (যাকে শ্রমই সৃষ্টি করে) + প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ (যা শ্রমশক্তি প্রয়োগের অপেক্ষায় থাকে)।

সমাজের উৎপাদন-শক্তি গঠিত হয় উৎপাদনের যে উপকরণগুলোর সাহায্যে বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়, যে জনগণ উৎপাদন অভিজ্ঞতা এবং শ্রমশক্তির কারণে উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যবহার করে এবং বৈষয়িক দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, সেসব কিছু নিয়ে। এ প্রসঙ্গে স্তালিন (J. V. Stalin) তাঁর '*Dialectical and Historical Materialism*' নামক পুস্তিকায় বলেন,

---

[১] J. V. Stalin, *op. cit.,* P. 247.

> The *instruments of production* wherewith material values are produced, the *people* who operate the instruments of production and carry on the production of material values thanks to a certain *production experience* and *labor skill* – all these elements jointly constitute the *productive forces* of society.[১]

অবশ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি এবং মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন-শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে। এদিক থেকে বলা যায় যে, উৎপাদন পদ্ধতির সবচেয়ে বেশি গতিশীল ও পরিবর্তনশীল দিক হলো উৎপাদন-শক্তি।

'*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনাকালে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক বিষয়ে বলেন, সমাজ ব্যবস্থার কোন একটি পর্যায়ে সমাজের উৎপাদনের বাস্তব হাতিয়ারগুলোর সাথে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের (সম্পত্তিগত সম্পর্ক) দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল উৎপাদনের হাতিয়ারগুলো। পূর্বে যা ছিল উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোর বিকশিত রূপ বর্তমানে তাই শৃঙ্খলতা লাভ করে। এ পর্যায়ে শুরু হয় সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের বিপ্লব। অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপান্তরের সাথে সাথে সমস্ত উপরিকাঠামো ক্রমে ক্রমে অথবা দ্রুত গতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন পদ্ধতির হাতিয়ারগুলোর যে পর্যন্ত বিকশিত হওয়া সম্ভব, উৎপাদন পদ্ধতির হাতিয়ারগুলোর সে পর্যন্ত বিকশিত না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যবস্থার বিলুপ্তি হয় না। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে যতদিন না নতুন উৎপাদন সম্পর্ক টিকে থাকার বাস্তব অবস্থা তৈরি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নতুন উৎপাদন সম্পর্ক উদ্ভব হয় না। এই কারণে মানুষ শুধু সেইসব করণীয় কাজই হাতে নিয়ে থাকে যা তার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে থাকে। কাজেই করণীয় কাজের উদ্যোগের উদ্ভব শুধু তখনই হয় যখন তা সম্পন্ন করার বাস্তবতা তৈরি হয় কিংবা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মার্ক্স-এর মতে, জীবনধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি। এইসব প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সংগ্রাম করে। আর এই সংগ্রামের পথেই ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় যুক্ত হয়ে যায়। রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন সবকিছুই অর্থনৈতিক

---

[১] J. V. Stalin, *Dialectical and Historical Materialism,* (Kolkata :National Book Agency Private Ltd, 2007), p. 28.

ভিত্তির সাথে জড়িত। অর্থাৎ সকল ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের উৎস হলো বস্তুগত শক্তির বিকাশ ও উৎপাদন-শক্তির মধ্যে।[১]

উৎপাদন পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উৎপাদন সম্পর্ক। ব্যক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি, শ্রমশক্তি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য উপকরণের সাথে যে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে উৎপাদন সম্পর্ক বলে। উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে না, উৎপাদনের নানাবিধ উপায়ের সঙ্গেও সে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এই সম্পর্ক ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত নয়। সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ব্যক্তিকে উৎপাদন করতে হয় এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অর্থাৎ, উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট সম্পর্ক অবশ্যই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দাস সমাজ ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্ককে উল্লেখ করা যায়। দাস সমাজ ব্যবস্থায় দাস মালিকের হাতে ছিল উৎপাদনের সকল প্রকার উপাদান। কিন্তু যে দাসদের শ্রম দ্বারা উৎপাদন হতো তারা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হতো। মার্ক্স-এর মতে, উৎপাদনের পদ্ধতি, দ্রব্য সামগ্রীর বণ্টন ও বিনিময়ের মধ্য থেকে উৎপাদন সম্পর্ক উদ্ভূত হয়। ইতিহাসে সমাজের উৎপাদন-শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্তালিন (J. V. Stalin) তাঁর *Dialectical and Historical Materialism* নামক পুস্তিকায় বলেন,

> "In conformity with the change and development of the productive forces of society in the course of history, men's relations of production, their economic relations also changed and developed."[2]

---

[১] This conception of history, which is common to all historians, particularly since the eighteenth century, will necessarily come up against the phenomenon that increasingly abstract ideas hold sway, i.e. ideas which increasingly take on the form of universality. For each new class which puts itself in the place of one ruling before it, is compelled, merely in order to carry through its aim, to represent its interest as the common interest of all the members of society, that is, expressed in ideal form: it has to give its ideas the form of universality, and represent them as the only rational, universally valid ones. The class making a revolution appears from the very start, if only because it is opposed to a class, not as a class but as the representative of the whole of society; it appears as the whole mass of society confronting the one ruling class." Karl Marx and Fredrick Engels, *The German Ideology,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* pp. 48-49.

[২] J. V. Stalin, *op. cit.,* P. 251.

১.৪ সমাজ শ্রেণী

মানব সমাজ বিকাশের ইতিহাসে মার্ক্স কয়েকটি পৃথক সুস্পষ্ট স্তর চিহ্নিত করেছেন। ইতিহাসে উৎপাদন পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রধান স্তরগুলো হলো:

১। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা;

২। দাস সমাজ ব্যবস্থা;

৩। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা;

৪। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা;

উল্লেখ্য, মার্ক্স ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সমাজ বিকাশের আরেকটি স্তর রয়েছে এবং সেটি হলো- কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা।

১। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা

সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে প্রথম সমাজ ব্যবস্থার স্তর বা রূপ হলো আদিম সাম্যবাদী সমাজ। মানব জাতি বহু সহস্র বছর কাল শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণী শাসন ও শোষণ ছাড়া জীবন অতিবাহিত করেছে। মানব জাতি কখনোই নিঃসঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত ছিল না, সব সময়ই সে গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করেছে। তবে মানুষ পশুর মতো জীবনযাত্রা পদ্ধতি পরিত্যাগ করে সর্বপ্রথম যখন সামাজিক সংগঠন তৈরি করলো তখনই আদিম সাম্যবাদী সমাজ তথা আদিম যৌথ সমাজের আবির্ভাব ঘটে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ গোষ্ঠী-প্রথার মধ্যে বসবাস করেছে। এই গোষ্ঠী-প্রথার আদিম সমাজ ব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ বলে। এই সমাজকে সমাজ বিকাশের প্রাচীনতম রূপ বা পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বা জীবন ধারণের জন্য নানা প্রকারের দ্রব্য-সামগ্রীর দরকার হয়। যেমন- খাদ্যের জন্য ফলমূল, মাছ, মাংস ইত্যাদি; আশ্রয়ের জন্য ঘরবাড়ি, শিকারের জন্য অস্ত্র। মানুষ শ্রমশক্তি ব্যবহার করে খাদ্যের জন্য ফলমূল, মাছ, মাংস ইত্যাদি সংগ্রহ করে; আশ্রয়ের জন্য প্রকৃতি থেকে ডালপালা, লতাপাতা সংগ্রহ করে ঘড়বাড়ি তৈরি করে; শিকারের জন্য প্রকৃতি থেকে পাথর সংগ্রহ করে হাতিয়ার বা অস্ত্র তৈরি করে। এভাবেই প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলোর উপর মানুষ তার নিজের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে। এই উৎপাদন ব্যবস্থার মূল দুটি উপাদন হলো– প্রকৃতি ও শ্রমশক্তি। মানুষের শ্রমশক্তি ও প্রকৃতির উপর শ্রমশক্তি প্রয়োগ করার কৌশল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মিলিত

শক্তিকে উৎপাদন-শক্তি বলে। প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি, কলাকৌশলের উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটে। উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তৈরি হয় তাই হলো উৎপাদন সম্পর্ক। কারণ মানুষ একা উৎপাদন করে না, সে উৎপাদন করে মিলিতভাবে বা সমাজবদ্ধভাবে। উৎপাদন সম্পর্ক স্থির হয় উৎপাদন উপাদানের মালিকানার ভিত্তিতে। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান ও যন্ত্রপাতির মালিক এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্ক দিয়ে উৎপাদন সম্পর্ক স্থির হয়। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, উৎপাদন শক্তির বিকাশ ও তার ফলে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ইতিহাসই সমাজ বিকাশের ইতিহাস।

মার্ক্স-এর মতে, মালিকানার প্রথম রূপ হলো গোষ্ঠী মালিকানা, যা ইতিহাসের অবিকশিত স্তরে উৎপাদনের প্রতিফল। এ ধরনের মালিকানার বিকশিত ধরন হলো- পশু শিকার, পশুপালন এবং কৃষিকাজ। এই স্তরে শ্রম-বিভাজন একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। সামাজিক কাঠামো এখানে পরিবার কেন্দ্রিক ছিল। মার্ক্স বলেন,

> The division of labour is at this stage still very elementary and is confined to a further extension of the natural division of labour existing in the family. The social structure is, therefore, limited to an extension of the family; patriarchal family chieftains, below them the members of the tribe, finally slaves. The slavery latent in the family only develops gradually with the increase of population, the growth of wants, and with the extension of external relations, both of war and of barter.[১]

আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলো সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকার কারণে সেখানে উৎপাদন-শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকাশ হতে পারেনি। অনুন্নত উৎপাদন-শক্তি ব্যবহার করে মানুষ জীবনধারণের জন্য দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করতো। পাথরের তৈরি অস্ত্র, তীর-ধনুক ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে তারা শিকার করতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হিংস্র পশুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হতো। অনুন্নত উৎপাদন-শক্তির কারণে এই সমাজ ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত উৎপাদনের সুযোগ ছিল না। আদিম সমাজের মানুষ জীবনধারণের জন্য উৎপাদন-শক্তি পরিপূর্ণ কাজে লাগাতে না পারার দরুন সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সংঘবদ্ধভাবে তারা চাষাবাদ, পশুপালন, শিকার, মাছ

---

[১] Karl Marx and Fredrick Engels, *The German Ideology,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* pp. 21-22.

Dhaka University Institutional Repository

ধরা ইত্যাদি কাজ করতো। তাই আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক তথা উৎপাদন উপাদানগুলোর (পাথরের অস্ত্র, তীর-ধনুক ইত্যাদি) মালিক ছিল গোটা সমাজ। কারণ কোন একজন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত কোন গোষ্ঠীর হাতে উৎপাদন শক্তি পুঞ্জীভূত ছিল না। এই সমাজ ব্যবস্থায় একাকী ব্যক্তিগতভাবে প্রাকৃতিক শক্তি ও হিংস্র পশুদের মোকাবেলা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। মানুষ একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে বাধ্য ছিল। উৎপাদন উপাদানে যৌথ মালিকানাই ছিল এই সমাজ ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি থেকে মানুষ যা আহরণ করতো তা সকলে সমানভাবে ভোগ করতো এবং সঞ্চয় করার ব্যবস্থা না থাকায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোন কিছু ছিল না। আদিম সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের কোন ধরনের বিকাশ না থাকায় প্রকৃতিকে ইচ্ছা মতো নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ ভোগের অতিরিক্ত দ্রব্যসমাগ্রী উৎপাদন করতে পারেনি। ফলে উদ্বৃত্ত দ্রব্যসমাগ্রীর সৃষ্টি হয়নি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণ না থাকায় এই সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। তবে ধীর গতিতে হলেও আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন যন্ত্রের উন্নতির প্রক্রিয়া চলছিল। মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করতে শিখলো (বিশেষ করে আগুনের আবিষ্কার বিরাট ভূমিকা পালন করে) শিকারের উদ্দেশ্যে তীর ধনুক তৈরি করতে শিখলো, মাটির পাত্র তৈরির কৌশল শিখলো — এভাবে বিকাশের এক নতুন স্তরে পৌছানো সম্ভব হলো। গবাদি পশুকে গৃগপালিত করা, শস্য উৎপাদন করা ইত্যাদি কৌশল আবিষ্কারের ফলে পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরু হলো। কৃষির অগ্রগতি ও পশু প্রজনন সামাজিক শ্রম বিভাগের জন্ম হলো, যেখানে সমাজের একটি অংশ কৃষিকাজের উপর মনোনিবেশ করলো এবং অপর অংশ পশুপালনের উপর মনোনিবেশ করলো। কৃষিকাজ থেকে পশুপালনকে পৃথকীকরণই হলো ইতিহাসে প্রথম সামাজিক শ্রম-বিভাজন। এই শ্রম-বিভাজনের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। তবে এই সমাজে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদন মোটেই যথেষ্ট ছিল না। ফলে কৃষিকাজে নিয়োজিত গোষ্ঠী এবং পশুপালনে নিয়োজিত গোষ্ঠী পরস্পরের মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময় শুরু করলো। আকর থেকে লোহা গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার এবং লিপির উদ্ভাবন বর্বর যুগের সমাপ্তি ঘটলো এবং সভ্যতার যুগের শুভ সূচনা হলো।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক মূলত উৎপাদন-শক্তির অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হতো। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল আদিম যন্ত্র এবং উৎপাদন উপায়ের গোষ্ঠী মালিকানা। উৎপাদন-শক্তি বিকাশের স্তরের অনুরূপ ছিল গোষ্ঠী মালিকানা। উৎপাদন-শক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমের উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেল। এক সময় দেখা গেল সমাজের নতুন উৎপাদন-শক্তি বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে আর স্বতঃস্ফূর্ত বিকশিত হতে পারছে না। শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত ফসলের গোষ্ঠী মালিকানা এবং সম বণ্টনের সীমাবদ্ধতা উৎপাদন-শক্তির বিকাশকে ব্যহত করলো। এভাবে উৎপাদন-শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে শেষ পর্যন্ত আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পড়ে এবং নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে।

২। দাস সমাজ ব্যবস্থা

সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য বস্তুর বিভিন্ন প্রকার উপযোগিতা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফল হিসেবে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটেছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোতে ভাঙন শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও শ্রেণীসমূহের উদ্ভবের ফল হিসেবে। উদ্বৃত্ত পণ্য বিনিময় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সুতা ও কাপড় তৈরি এবং ধাতব জিনিস তৈরি ব্যক্তিগত দক্ষতা বা ব্যক্তিগত উৎপাদন পদ্ধতির জন্ম দেয়। কৃষি জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রাধান্য পেতে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্থায়ী রূপ পাওয়ার ফলে এবং উৎপাদনে ব্যক্তিগত শ্রম অপর্যাপ্ত হওয়ার ফলে অধিক পরিমাণে শ্রমশক্তি নিয়োগের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। শ্রমের হাতিয়ার উন্নততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এই শ্রমশক্তির চাহিদা তারা পূরণ করতো যুদ্ধবন্দীদের দাসে পরিণত করে। অর্থাৎ এই যুদ্ধবন্দীদের ব্যবহার করা হতো পশুর মতো বা যন্ত্রের মতো। শুরুতে এই দাস প্রথা ছিল পারিবারিক প্রথা হিসেবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই প্রথাই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক হিসেবে স্থায়ী রূপ লাভ করে। এই দাস-শ্রম ব্যবস্থা শুরু হওয়ার ফলে বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। যে পরিবারগুলো দাস-শ্রম ব্যবহার করতো তারা অন্যদের চেয়ে ধনী ও সম্পদের মালিক হয়ে যায়। এই সম্পদশালীরা একদিকে যেমন যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে নিয়োগ করতো অন্যদিকে সম্পদহীন সমগোত্রীদেরকেও দাস হিসেবে নিয়োগ করতো। এইভাবেই প্রথম সুস্পষ্ট শ্রেণী-বিভাজন দেখা দেয় — দাস-মালিক শ্রেণী ও দাস শ্রেণী। এভাবে সচেতনভাবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। এই দাস-মালিকশ্রেণীই তাদের শোষণ ব্যবস্থাকে বিকশিত করার জন্য রাষ্ট্র গড়ে তোলে। এই দাস সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভবকে সভ্যতার উদ্ভব বলা হয়। এঙ্গেলস এর মতে, বর্বরতার মধ্যবর্তী স্তরের একেবারে শেষ দিকেই যে স্থানভিত্তিক বসতি গড়ে উঠেছিল বারবার তা ব্যাহত হয় গতিশীলতা বা বাসভূমির পরিবর্তনগত কারণে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা বদল ও জমি হস্তান্তরের কারণে। গোত্র সংগঠনের লোকেরা নিজেদের সাধারণ ব্যাপারে একত্রে বসতে পারতো না। গোত্রের বিভিন্ন সংস্থা প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখার জন্য নিযুক্ত থাকলেও জীবিকা অর্জনের অবস্থা এবং সমাজ কাঠামোতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন প্রয়োজন ও স্বার্থ দেখা দেয়। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের জন্য নতুন নতুন সংস্থার প্রয়োজন পড়ে। নতুন সংস্থাগুলো গড়ে উঠে গোত্রীয় অনুশাসনের বাইরে, তার সমান্তরাল ও গোত্রীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে। একই গোত্র ও উপজাতির মধ্যে ধনী ও দরিদ্র, মহাজন ও দেনাদার থাকায় প্রত্যেকটি গোত্র সংগঠনের মধ্যে পরস্পর স্বার্থের বিরোধ প্রকট হয়। অথচ গোত্র প্রথা এমন একটি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যেখানে কোন আভ্যন্তরীণ বিরোধ ছিল না।

কিন্তু তার জায়গায় দেখা দিলো এমন একটি সমাজ যেখানে জীবনধারণের সকল অর্থনৈতিক অবস্থায় সমাজকে বিভক্ত হতে হলো শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে—স্বাধীন নাগরিকে এবং ক্রীতদাসে, ধনী শোষক ও শোষিত দরিদ্রে। কাজেই দাস সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের অনিবার্য ফল হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, যা অবশ্যই শ্রেণী বিরোধের ফল। অর্থাৎ, আদিম সাম্যবাদী সমাজের রাষ্ট্রহীন কাঠামোর স্থানে উদ্ভব হয় রাষ্ট্রের, যার প্রধান কাজ হলো দাস মালিকদের সম্পত্তি রক্ষা করা। এঙ্গেলস তাঁর '*Origins of the Family, Private Property, and the State*' (1884) গ্রন্থে বলেন,

> The settled conditions of life which had only been achieved towards the end of the middle stage of barbarism were broken up by the repeated shifting and changing of residence under the pressure of trade, alteration of occupation and changes in the ownership of the land. ...each of these groups was composed of people of the most diverse gentes, phratries, and tribes, and even included aliens. Such organs had therefore to be formed outside the gentile constitution, alongside of it, and hence in opposition to it. And this conflict of interests was at work within every gentile body, appearing in its most extreme form in the association of rich and poor, usurers and debtors, in the same gens and the same tribe. ... Such a society could only exist either in the continuous open fight of these classes against one another, or else under the rule of a third power, which, apparently standing above the warring classes, suppressed their open conflict and allowed the class struggle to be fought out at most in the economic field, in so-called legal form. The gentile constitution was finished. It had been shattered by the division of labor and its result, the cleavage of society into classes. It was replaced by the state.[১]

দাস সমাজ ব্যবস্থা হলো ইতিহাসে প্রথম প্রকাশ্য নির্মম ও নগ্ন শোষণের রূপ। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শুধুমাত্র ইউরোপেই নয়, মিশর, চীন ও ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা

---

[১] Fredrick Engels , *Origins of the Family, Private Property, and the State,* Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* pp. 325-326.

বিদ্যমান ছিল খ্রিস্টপূর্ব চার থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে। গ্রিসে এই ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে। রোমে এই ব্যবস্থা সবচেয়ে বিকশিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দাস সমাজ ব্যবস্থার সূচনালগ্নে উৎপাদন-শক্তি সমূহের বিকাশ হয়েছিল অবাধ। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলো উন্নততর হতে থাকে, কৃষিকাজ ও হস্তশিল্প উন্নততর হতে থাকে। শ্রমশক্তি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা দূর হয়। লোহার কুঠার ও লাঙল তৈরির ফলে কৃষিযোগ্য জমি বৃদ্ধি পায়। আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে জমি, পশুপাখী, হস্তশিল্প ও শ্রমের অন্যান্য হাতিয়ারগুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী ও শ্রেণী-বিভাজন, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ শুরু হয়। এই দাস সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কগুলোর ভিত্তি ছিল বিকাশমান উৎপাদনের উপায়গুলো (জমি, হস্তশিল্প ও শ্রমের হাতিয়ারগুলো) এবং উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিক তথা দাস শ্রমিক। একসময়ে যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসেবে ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীতে সম্পদহীন ও গরীবদেরকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। সৃষ্টি হয় দাস কেনা বেচার বাজার, যাদেরকে ক্রীতদাস বলা হয়। এঙ্গেলস-এর মতে, মানুষকে দাসে পরিণত করে মনুষ্য শক্তির বিনিময় ও ব্যবহার সম্ভব। মানুষ বিনিময় শুরু করতে না করতেই তারা নিজেরাই বিনিময় বস্তু হয়ে গেল। দাসপ্রথা, যা সভ্যতার যুগে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে তার সঙ্গেই সমাজে শোষক ও শোষিতের প্রথম বৃহৎ শ্রেণীভেদ আসে। এঙ্গেলস তাঁর '*Origins of the Family, Private Property, and the State*' (1884) গ্রন্থে বলেন,

> It was not long then before the great "truth" was discovered that man also can be a commodity; that human energy can be exchanged and put to use by making a man into a slave. Hardly had men begun to exchange than already they themselves were being exchanged. ... With slavery, which attained its fullest development under civilization, came the first great cleavage of society into an exploiting and an exploited class. This cleavage persisted during the whole civilized period. Slavery is the first form of exploitation, the form peculiar to the ancient world; it is succeeded by serfdom in the middle ages, and wage-labor in the more recent period.[১]

এই দাস শ্রমশক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন উপায়সমূহের মালিকশ্রেণী উৎপাদনশীলতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট এলাকার সীমা অতিক্রম করে পণ্য বিনিময় হতে থাকে দূর-

[১] *Ibid.,* pp. 331-332.

Dhaka University Institutional Repository

দূরান্তে। ফলে শ্রেণী হিসেবে নতুন আরেকটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়—বণিকশ্রেণী। পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার বিকাশ, বণিকশ্রেণীর বিকাশ এবং মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ সৃষ্টি করে পণ্য বিনিময় কেন্দ্র। এভাবে গড়ে উঠে ছোট বড় নগর ও শহর। শহর হয়ে উঠে বণিকশ্রেণীর বাসস্থান, যারা সম্পদশালী ও দাস-মালিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। আর গ্রামাঞ্চল হয়ে উঠে কৃষকশ্রেণী ও দাস-শ্রমিকশ্রেণীর বাসস্থান। সম্পদশালী ও দাস-মালিকরা হাজার হাজার দাস-শ্রমিক লালন পালন করতে থাকে। বিস্তৃত এলাকা দখল করে সম্পদশালী ও দাস-মালিকরা দাস-শ্রমিকশ্রেণীকে কৃষিকাজে ব্যবহার করে। এর ফলে সম্পদশালী ও দাস-মালিকরা এক একটি রাজ্যের (Estates) মালিক হয়ে যায়। উৎপাদনের উপায়সমূহ ও শ্রমের হাতিয়ারগুলো এবং ধন, সম্পদ, টাকা, পয়সা ইত্যাদি ধনীদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে দাস-মালিকদের মধ্যে ধনী দরিদ্র বিভাজন হয়। গরীবরা ধনীদের কাছ থেকে টাকা ও শ্রমের হাতিয়ার সুদে ধার করতে বাধ্য হয়। এভাবে পরস্পর স্বার্থবিরোধী শ্রেণীগুলোর উদ্ভব হওয়ার ফলে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংগ্রাম বিকশিত হতে থাকে।

৩। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা

দাস-শ্রম ভিত্তিক সমাজের দাস-অর্থনীতি বিকাশের পর্বে তখনই শোষক শ্রেণী ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র রূপ ধারণ করে যখন দাস অর্থনীতি সামাজিক উৎপাদন বিকাশের পথে বাধা হিসেবে দাঁড়ায়। এই পর্বে দাস-শ্রেণী দাস-মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জেগে উঠে এবং শ্রেণী সংগ্রামের উন্নতর বিকাশ ঘটে। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাইরের শত্রু আক্রমণ দ্বারাও ক্রমে ক্রমে দাস-মালিক শ্রেণী রাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটে এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ দাস সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলোর উদ্ভব ঘটে। ইতিহাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একটি দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাজা নির্দিষ্ট শর্তে সামন্তপ্রভুদের হাতে জমি সমর্পণ করতো এবং সামন্তপ্রভুরা জমিতে উৎপাদন করার শর্তে কৃষকের মধ্যে জমি বণ্টন করতো। উল্লেখ্য, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমস্ত জমির মালিক হলেন রাজা। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তে রাজা জমির মালিকানা হস্তান্তর করতো সামন্তপ্রভুদের হাতে, সামন্তপ্রভু আবার নিদিষ্ট শর্তে জমি হস্তান্তর করতো কৃষকের মাঝে। উৎপাদনের উপায় হিসেবে জমির উপর সামন্তপ্রভুর (ভূ-স্বামীর ব্যক্তিগত মালিকানা) ও কৃষক তথা ভূমিদাসদের (serfs) উপর অংশ মালিকানা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন সম্পর্কগুলোর ভিত্তি। কৃষকেরা দাস সমাজের মত প্রভুর ক্রীতদাস না থাকলেও ভূ-স্বামীরা জমি হস্তান্তর করলে জমির সঙ্গে কৃষকগণ তথা ভূমিদাসগণও হস্তান্তর হতো। দাস সমাজে ক্রীতদাসদের বসবাসের জন্য নিজস্ব কোন জমি ছিল না, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষক তথা ভূমিদাসদের (serfs) বসবাসের জন্য নিজস্ব জমি সাধারণভাবে ছিল। ভূ-স্বামীরা জায়গির-এর একটি অংশ নিজস্ব এস্টেট হিসেবে রাখতো এবং বাকি অংশ বিভিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ থাকার শর্তে কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে ভাগ করে দিত।

Dhaka University Institutional Repository

এই উভয় কারণে এক একজন ভূ-স্বামীর অধীনে নিজস্ব কৃষক (শ্রমশক্তি) থাকা ছিল অত্যাবশ্যক। কার অধীনে কত শ্রমশক্তি তার দ্বারাই ভূ-স্বামীর মর্যাদা ও শক্তি নির্দিষ্ট হতো। কৃষকদের নিযুক্ত করার শর্ত ছিল হয় নিজস্ব সরঞ্জাম (খাজনাস্বরূপ শ্রম) দ্বারা ভূ-স্বামীর জমিতে ফসল উৎপন্ন করা অথবা উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ (খাজনাস্বরূপ ফসল) ভূ-স্বামীকে দেওয়া। ক্রমে ক্রমে ফসলের পরিবর্তে মুদ্রায় (টাকায়) খাজনা আদায় করা শুরু হয়। শোষণের এই আইনীরূপের পাশাপাশি ভূ-স্বামীর নিকট কৃষকদের ব্যক্তিগত অধীনতাও ছিল শোষণের অন্য একটি রূপ। এছাড়া শোষণের অন্যান্য রূপও ছিল। যেমন– কৃষকদের পারিশ্রমিক ছাড়া শ্রমে বাধ্য করা, ফসলে বা টাকায় খাজনা সময়ে সময়ে অত্যাধিক বৃদ্ধি করা, কোন প্রকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার না থাকা ইত্যাদি। কৃষক তথা ভূমি-দাসরা জমির সঙ্গে বাঁধা থাকার কারণে জমির সঙ্গে কৃষকদের বিক্রি করার অধিকার সামন্তপ্রভুদের ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন পদ্ধতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভূমি-দাসদের কাজের সময় ছিল দুইভাগে বিভক্ত। যথা: আবশ্যকীয় এবং উদ্বৃত্ত। নিজস্ব পারিবারিক ভরণ-পোষণের জন্য উৎপাদনে ব্যয়িত সময় ছিল আবশ্যকীয় এবং ভূ-স্বামীকে প্রদানের জন্য উৎপাদনে ব্যয়িত সময় ছিল উদ্বৃত্ত। কৃষক তার ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যা পেত তা দ্বারা অতিরিক্ত কোন সঞ্চয় হতো না। কিন্তু ভূ-স্বামী তার অধীন কৃষকদের কাছ থেকে যা পেত তা থেকে অনেক উদ্বৃত্ত হতো। কৃষকদের সঙ্গে জমি বেঁধে দেয়ার ফলে এই ব্যবস্থায় উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল। ভূ-স্বামীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জমিতে হস্তশিল্প ও হস্তশিল্পীদের কাজের সময়ও অনুরূপ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে হস্তশিল্পের বিকাশ দ্রুততর হয়েছিল। কৃষি ও হস্তশিল্পে বিকাশের গতি দ্রুততর হওয়ার কারণে ব্যবহার্য উপকরণের বিনিময় বেড়ে গেল। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যারা কাজ করতো তারা পরিগণিত হলো ব্যবসায়ী হিসেবে। গড়ে উঠে ব্যবসার কেন্দ্র বা শহরগুলো। এই শহরগুলো আবার হস্তশিল্প কেন্দ্রও ছিল। সামন্তপ্রভুদের হাতে জমির মালিকানা থাকার কারণে তাদের জায়গিরগুলোর মধ্যে গড়ে উঠা শহরগুলো ছিল তাদের অধীন এবং হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ীদের উপর তাদের আধিপত্য ছিল। শিল্প ও ব্যবসার প্রসার যতই বাড়তে থাকলো ততই গ্রাম অঞ্চলে এর প্রভাব বাড়তে থাকলো অর্থাৎ, ভূ-স্বামীদের অর্থনীতির উপর ব্যবসায়ীদের প্রভাব বাড়তে থাকলো। বিলাস দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ভূ-স্বামীদের নিকট টাকার চাহিদা বেড়ে গেল এবং তারা খাজনা হিসেবে ফসলের পরিবর্তে টাকা আদায় করা ক্রমাবর্ধমান হারে চালু করতে থাকে। ফলে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। অর্থাৎ সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে ভূমি-দাসদের দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম বাড়তে থাকে। অন্যদিকে শহরগুলো সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করে। ফলে ব্যবসায়ীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কার্ল মার্ক্স-এর মতে, ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির স্বাভাবিক রূপ হয় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুক্ত মালিকানা। অর্থাৎ, উৎপাদন পদ্ধতি হলো নিজের জমিতে নিজের শ্রম নিয়োগ

করে উৎপাদন করার জন্য নিজের হাতে জমি থাকা চাই এবং কৃষক মুক্ত মালিক হোক অথবা অন্যের প্রজা হোক নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য সপরিবারকে উৎপাদনে নিয়োজিত থাকতে হবে। এই উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের জন্য কৃষকদের জমির মালিকানা থাকা আবশ্যক এবং হস্তশিল্পের উৎপাদন অবাধ বিকাশের জন্য উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর মালিকানা থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিকাশের জন্য এটিই হলো ভিত্তি। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এটি হলো আবশ্যকীয় উত্তরণপর্ব। এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলো আবার এই অবস্থার পতন ঘটায়। যেমন- গ্রামীণ দেশীয় শিল্পের ধ্বংস, বৃহৎ শিল্প প্রসারের কারণে জমির উৎকর্ষতার ক্রমহ্রাস, বৃহৎ ভূ-স্বামীদের দ্বারা কৃষক উৎখাত, বাগিচা উৎপাদন ব্যবস্থা বা বৃহদাকার পুঁজিবাদী কৃষি উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কৃষিপণ্যের বাজার দর হ্রাস। অন্যদিকে, উৎপাদনের জন্য অধিকতর মাত্রায় পুঁজির আবশ্যকতা ইত্যাদি যা দেখা গিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইল্যান্ডে। মার্ক্স তাঁর '*Capital*' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সাতচল্লিশতম অধ্যায়ে বলেন,

> The free ownership of the self-managing peasant is evidently the most normal form of landed property for small-scale operation, i.e., for a mode of production, in which possession of the land is a prerequisite for the labourer's ownership of the product of his own labour, and in which the cultivator, be he free owner or vassal, always must produce his own means of subsistence independently, as an isolated labourer with his family. ... Improvements in agriculture, which on the one hand cause a fall in agricultural prices and, on the other, require greater outlays and more extensive material conditions of production, also contribute towards this, as in England during the first half of the 18th century.[১]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশ অবাধ হয়। কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখা ব্যাপক প্রসারতা লাভ করে। যেমন- খাদ্য শস্যের চাষ, বাগিচা, নানাবিধ ফলের চাষ ইত্যাদি বিকাশ লাভ করে। পশুপালন প্রথা একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করায় মাংস, পশম, চামড়া, মাখন ঘি ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। হস্তশিল্পের ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কাঁচামালকে ব্যবহারযোগ্য করার পদ্ধতি উন্নত হয়, কারিগরদের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়, নতুন নতুন হাতিয়ার ও পাত্র তৈরি হতে থাকে। উন্নত অস্ত্র, উন্নত চর্ম–পোশাক, ধাতব পদার্থে নির্মিত দ্রব্যাদির মান উন্নত হতে থাকে। এই সকল বিকাশের সাথে

---

[১] Karl Marx, *Capital*, Vol-3, Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Volume 37, *op. cit.,* P. 793.

সাথে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ, উপরিকাঠোমোর বিকাশ ঘটে। এই সকল বিকাশের অর্থ উৎপাদন শক্তির বিকাশ। কৃষিজাত দ্রব্য ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যগুলোর উৎপাদন ও চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় ব্যবস্থার প্রসার লাভ করে এবং পণ্যের বাজার প্রসারিত হতে থাকে। এই সকল সরল পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল মূলত নিজস্ব সম্পত্তিতে নিজস্ব শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং এর উদ্দেশ্য ছিল নিজস্ব তথা পারিবারিক ভরণপোষণ বা ভোগের জন্য উৎপাদন করা। সামন্ত রাজারা ও সামন্তপ্রভুরা ফসলে বা টাকায় খাজনা উসুলের মাধ্যমে যে বিরাট পরিমাণ পণ্য সঞ্চয় করতো তার দ্বারা তারা ভোগের জন্য বিলাস দ্রব্য সংগ্রহ করতো । সরল পণ্য বিনিময়ের বাজার যতই প্রসারিত হতে থাকে ততই তার উপর সামন্তপ্রভুদের লোভ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে, ব্যবসায়ীদের তথা ব্যবসায়িক টাকার প্রভাবও বাড়তে থাকে। সামন্তপ্রভুরা পণ্যের বাজারের উপর নিজেদের একচেটিয়া প্রভাব কায়েম করার জন্য কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত জমি থেকে কৃষকদের উৎখাত করতে শুরু করে। জমি থেকে কৃষকদের ব্যাপকহারে উৎখাতের ফলে জমিগুলো পশুচারণভূমিতে পরিণত হয়। উৎপাদনের উপায় থেকে উৎখাত হওয়া কৃষকরা ভবঘুরে বা নিঃস্ব কৃষকে পরিণত হয়। এভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নতুন সম্পর্কের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ভূ-স্বামী ও নিঃস্ব কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং শ্রেণী-বিভাজন স্পষ্ট হয়।

অন্যদিকে, ব্যবসায়িক মুদ্রা তথা পুঁজির অধিকারী হওয়ায় ব্যবসায়িরা ক্ষুদ্র কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সরাসরি নিজস্ব অধীনস্থ করতে শুরু করে। নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনতে শুরু করে এবং কাঁচামাল ও পুঁজি ধার বা দাদন দিতে শুরু করে। এভাবে ক্ষুদ্র উৎপাদকেরা অর্থনৈতিকভাবে ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের পুঁজির আধিপত্য প্রসারে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং নতুন সম্পর্কের অবাধ সৃষ্টি ও বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য পুঁজিবাদী ভূ-স্বামীদের দ্বারা কৃষক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও পণ্য ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের বিরুদ্ধে নানা প্রকার আইন সৃষ্টি করে। পুঁজিবাদী হস্তশিল্পের বিরুদ্ধে গিল্ড কর্মকর্তাগণও বিধি-নিষেধ আরোপ করে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এই ভূমিকার কারণে কৃষক ও পুঁজিবাদী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের শ্রেণী-দ্বন্দ্বগুলো ও সংগ্রামগুলো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শ্রেণীগুলোর সংগ্রাম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপ নেয়। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদীরা শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত হয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে সামন্তশ্রেণীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার পথ উন্মুক্ত করে।

৪। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে নতুন উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পর্কসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। নতুন পদ্ধতি উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শ্রেণীসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। যথা: বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী। সামন্তশ্রেণীর মতো বুর্জোয়া শ্রেণীও ছিল মূলত শোষক শ্রেণী। সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রাম ছিল এক শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য এক শোষক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল মূল উৎপাদক তথা কৃষকদেরকে জমির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে তাদেরকে ভূমি-দাসে পরিণত করে শোষণ করা। আর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো মূল উৎপাদক তথা শ্রমিক শ্রেণীদেরকে মজুরি-দাসে পরিণত করে তাদেরকে শোষণ করা। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা–এই দুই ব্যবস্থার সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো শোষণ। এই দুই ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য হলো– সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ব্যক্তির বা পরিবারের ভোগের জন্য নিজে বা অন্যের দ্বারা উৎপাদন করা, বাজারে বিক্রয়ের জন্য নয়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎপাদনের উদ্দেশ্য হলো মূলত বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করা, ভোগের জন্য নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট বাজার থাকে। এই জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাজার অর্থনীতি বলা হয়। নিচে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো–

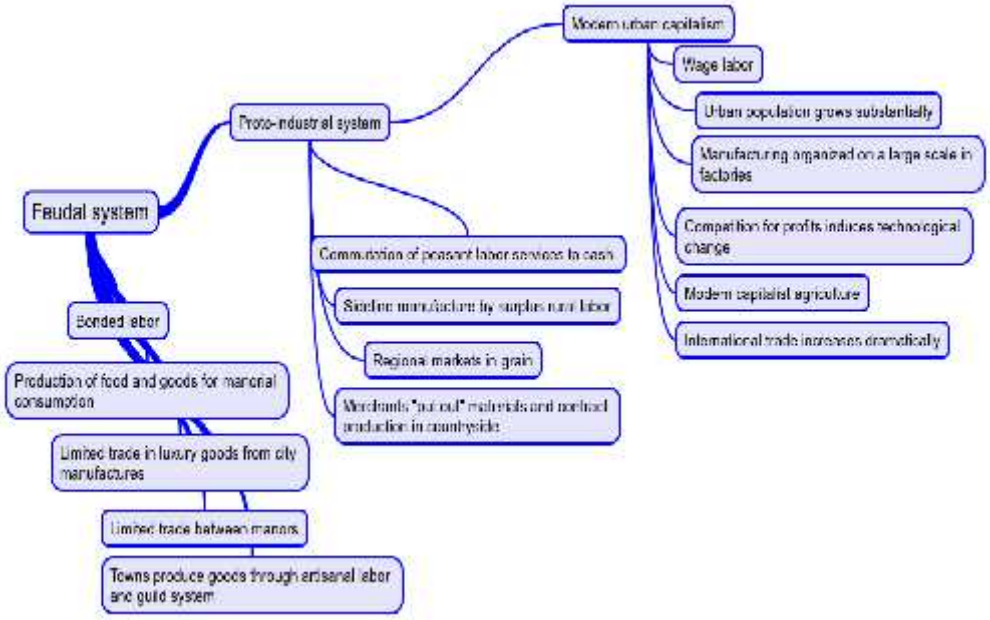

আগেই বলা হয়েছে যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে মূলত বাজারের মাধ্যমে বিনিময়ের জন্য পণ্যসমূহের উৎপাদন পদ্ধতি শুরু হওয়ার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদী উৎপাদন

পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল। সাধারণত পণ্য বলতে মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য তথা সামাজিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসমূহকে বুঝায়। যেমন- দাস সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভোগ্য পণ্য উৎপাদিত হতো। কিন্তু এই সব সমাজ ব্যবস্থায় বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করা হতো না। খাজনা প্রদান ও নিজের তথা পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য অতিরিক্ত কিছু দ্রব্য আবশ্যক, যা অন্য কোন দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য বিনিময় করা হতো। এই প্রকার পণ্যকে সরল পণ্য বলা হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য বলতে এমন একটি সামগ্রীকে বোঝায় যা প্রথমত, মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদিত হয়, দ্বিতীয়ত, যা উৎপাদকের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য উৎপাদিত হয় না বরং অপরের ভোগের জন্য উৎপাদন করা হয় অর্থাৎ বাজারে বিক্রয়ের জন্যই কেবল উৎপাদিত হয়। যেমন- শিল্পকারখানার মালিক এবং শ্রমিকগণ তাদের নিজের ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদন করে না, তারা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করে। কাজেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিজের ভোগের জন্য পণ্য উৎপাদন করলে তাকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হয় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনে শ্রম-শক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াটির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায় শ্রম-শক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রম-শক্তি আত্মসাৎ করা হয়, যার রূপটি নির্ভর করে নির্দিষ্ট সামাজিক রূপের উপর। শ্রম-শক্তি ব্যবহার করার প্রক্রিয়ার সামাজিক রূপটি উৎপাদন সম্পর্কসমূহের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন উপায়ের মালিকানা স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন সমাজে শ্রম-শক্তি ব্যবহার করার প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে সেই সমাজের উৎপাদন উপায়সমূহের মালিকানা কোন্ শ্রেণীর হাতে থাকে তার উপর। পুঁজিবাদী সমাজে এর মালিকানা থাকে পুঁজিপতি হাতে এবং শ্রমিকশ্রেণী থাকে বঞ্চিত। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রম-শক্তি ব্যবহার করার প্রক্রিয়াটি হলো: (১) উৎপাদন উপায়সমূহ থেকে বঞ্চিত শ্রম-শক্তির বিক্রেতাগণ পুঁজিপতি মালিকদের সাথে বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট শর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর পুঁজিপতি দ্বারা শ্রমিকেরা কাজে নিযুক্ত হয় এবং পুঁজিপতির তত্ত্বাবধানে শ্রম-শক্তি ব্যবহার করতে শুরু করে। শ্রমিক তাঁর শ্রম-শক্তি ব্যবহার মালিক তথা পুঁজিপতির জন্য আবার নিজের ও নিজের পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্যও। (২) পুঁজিপতি নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে কী কাজ করতে হবে, কী উৎপাদন করতে হবে, কী পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে, কোন উপায়ে উৎপাদন করতে হবে এবং কত সময়ে উৎপাদন করতে হবে। অর্থাৎ, পুঁজিপতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমিক কাজ করে বা শ্রম-শক্তি ব্যয় করে থাকে। (৩) শ্রমিকরা শ্রমশক্তি ব্যয় করার প্রক্রিয়ায় যে পণ্য উৎপাদন করে তারা তার মালিক নয়। তারা উৎপাদন করে পুঁজিপতির জন্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে শ্রমিকের কাজ করতে বলা হয় বলে এই ব্যবস্থাকে শ্রম-শক্তির বলপূর্বক ব্যবহার তথা শ্রমিক শোষণ ব্যবস্থা বলা হয়।

মার্ক্স-এর মতে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নিজ থেকেই শ্রমশক্তি ও শ্রমের উপকরণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে পুনরুৎপাদন করে থাকে। এই ব্যবস্থা শ্রমিককে শোষণ করার শর্ত পুনরুৎপাদন

করে এবং তা স্থায়ী করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য তার নিজের শ্রমশক্তি অবিরতভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং শ্রমশক্তি ক্রয় করতে পুঁজিপতিকে আরো ধনী ও সামর্থ্যবান করে তোলে। এক্ষেত্রে শ্রমিক বাঁচার জন্য জীবনধারণের উপকরণ দাবী করে, আর পুঁজিপতি তথা মালিক মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রম দাবি করে। ফলে পুঁজিপতি ও শ্রমিক ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসেবে বাজারে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এই প্রক্রিয়ায় অবিরামভাবে শ্রমিক তার নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করার জন্য বাজারে যায় এবং তার নিজের উৎপাদনকে এমন এক উপায়ে পরিণত করে, যার সাহায্যে পুঁজিপতি তথা মালিক তাকে ক্রয় করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক নিজেকে পুঁজির কাছে বিক্রয় করার আগেই পুঁজির অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে কিছুদিন পর পর শ্রমিকের নিজেকে বিক্রয় করা, তার প্রভু পরিবর্তন এবং শ্রমশক্তির বাজার দাম হ্রাসবৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের মধ্যে এক ধরনের অর্থনৈতিক দাসত্ববন্ধন সৃষ্টি হয়। কাজেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরস্পর সংযুক্ত এবং পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা একদিকে যেমন পণ্য ও উদ্বৃত্তমূল্য উৎপন্ন করে অন্যদিকে তেমন পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলোও উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স তাঁর '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থের তেইশ অধ্যায়ে বলেন,

> Capitalist production, therefore, of itself reproduces the separation between labour-power and the means of labour. It thereby reproduces and perpetuates the condition for exploiting the labourer. It incessantly forces him to sell his labour-power in order to live, and enables the capitalist to purchase labour-power in order that he may enrich himself. It is no longer a mere accident, that capitalist and labourer confront each other in the market as buyer and seller. It is the process itself that incessantly hurls back the labourer on to the market as a vendor of his labour-power, and that incessantly converts his own product into a means by which another man can purchase him.[১]

মার্ক্স-এর মতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কেবল যে পণ্য ও উদ্বৃত্তমূল্য উৎপন্ন করে তা নয়। বরং পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলোও উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করে, যার একদিকে থাকে পুঁজিপতি এবং অপরদিকে থাকে মজুরি-শ্রমিক। মার্ক্স বলেন,

---

[১] Karl Marx, *Capital : A Critique of Political Economy,* Vol. 1, (Moscow : Progress Publishers, 1954), p. 383.

Dhaka University Institutional Repository

> Capitalist production, therefore, under its aspect of a continuous connected process, of a process of reproduction, produces not only commodities, not only surplus-value, but it also produces and reproduces the capitalist relation; on the one side the capitalist, on the other the wage labourer.[১]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি উৎপাদনের জন্য যাবতীয় আবশ্যকীয় সামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করে। যেমন- কাঁচামাল, শ্রম-শক্তি, মেশিন, যন্ত্রপাতি, জ্বালানি ইত্যাদি। শিল্পকারখানায় উৎপাদন শুরু হয় — শ্রমিকরা মেশিন চালাতে শুরু করে, জ্বালানি পুড়তে থাকে, কাঁচামাল ব্যবহৃত থাকে এবং নির্দিষ্ট পণ্য তৈরি হয়। পণ্য তৈরি হওয়ার পর পুঁজিপতি তা বাজারে বিক্রয় করে। তার লগ্নীকৃত টাকা ফিরে আসে বর্ধিত রূপে এবং সেই টাকা আবার লগ্নী করে আরো কাঁচামাল, মেশিনপত্র, শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এভাবেই চক্রাকারে উৎপাদন ও বিক্রয় চলতে থাকে।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহ কেবল পুঁজিতে পরিণত হয় তখনই যখন সেগুলো পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কারণ পুঁজি ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত এক সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ককে সূচিত করে, যে ব্যবস্থায় উৎপাদনের হাতিয়ারসমূহ ও উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং শ্রমশক্তি পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। শ্রমিকশ্রেণী হলো সমাজের প্রধান উৎপাদন-শক্তি। কিন্তু তারা উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ফলে তাদেরকে পুঁজিপতি শ্রেণীর নিকট শ্রমশক্তিকে বাধ্য হয়ে বিক্রয় করতে হয় এবং শোষণের হাতিয়ার হিসেবে বাঁচতে হয়। মার্ক্স-এর মতে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক উষালগ্নে প্রত্যেক পুঁজিপতি ভুঁইফোঁড়কেই ব্যক্তিগতভাবে একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। অতিরিক্ত ধনলোভ ও ধনী হওয়ার ইচ্ছা হয় পুঁজিপতির প্রধান কামনা। পুঁজিপতি ধনী হয় সেই হারে যে হারে অন্যদের শ্রমশক্তি নিংড়ে নিতে পারে এবং জীবনের সমস্ত উপভোগ থেকে শ্রমিককে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারে। মার্ক্স তাঁর '*Capital*' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চব্বিশতম অধ্যায়ে বলেন,

---

[১] *Loc. cit.*

> At the historical dawn of capitalist production, — and every capitalist upstart has personally to go through this historical stage — avarice, and desire to get rich, are the ruling passions. But the progress of capitalist production not only creates a world of delights; it lays open, in speculation and the credit system, a thousand sources of sudden enrichment. When a certain stage of development has been reached, a conventional degree of prodigality, which is also an exhibition of wealth, and consequently a source of credit, becomes a business necessity to the "unfortunate" capitalist. Luxury enters into capital's expenses of representation.[১]

মানব সমাজের প্রথম শ্রেণী বিভাজন শুরু হয় দাস সমাজ ব্যবস্থায় — দাসশ্রেণী ও দাস-মালিক শ্রেণী। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এর স্থানে দেখা দেয় ভূমিদাস (serf) ও ভূ-স্বামী বা সামন্তপ্রভু (Lords)। পুঁজিবাদী সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণী হলো- মজুরিশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণী এবং পুঁজিপতিশ্রেণী। পুঁজিপতি শ্রেণী উৎপাদন উপায়ের মালিক হওয়ার ফলে তার দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে এবং শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণের শিকার হয়ে বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথাঃ শোষকশ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণী। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজমান তা হলো বৈরী সম্পর্ক। কারণ তাদের স্বার্থ পরস্পরের বিপরীত। পুঁজিপতি শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণী পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হলেও (বিপরীতের ঐক্য থাকলেও) তাদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলতে থাকে। কারণ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা যত বিকশিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাও তত বাড়তে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী তাদের স্বাভাবিক সামাজিক অবস্থানগত কারণে মালিক শ্রেণীর কাছে শ্রমশক্তি বিক্রয় করে এবং বেঁচে থাকার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয় শ্রেণী-সংগ্রামে ও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়। শ্রমিকশ্রেণী তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাজনৈতিকভাবে শ্রেণী সচেতনতা অর্জন করতে থাকে এবং বিকশিত হয়। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী

---

[১] Karl Marx, *Capital*, Vol-1, Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Volume 35 (New York : International Publishers, 1996), pp. 589-590.

তথা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য নিজেদেরকে সংগঠিত করে। এই শ্রমিকশ্রেণীই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে জন্ম নেয়া ও বিকশিত সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির অবাধ বিকাশের জন্য পুঁজিপতিশ্রেণী ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা উৎখাত করার লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম এবং সেই লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

অতএব, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সকল প্রকার শিল্পকারখানা, জমি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় সামাজিকভাবে এবং তার সুফল ভোগ করে কেবল পুঁজিপতিশ্রেণী বা উৎপাদন উপায়সমূহের মালিকশ্রেণী। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রটি এবং তার ফল আত্মসাৎকারী ব্যক্তিগত রূপটির মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয় এবং এই দ্বন্দ্ব ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলে। এই দ্বন্দ্বটিই হলো পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বটি উৎপাদন শক্তিসমূহের অবিরাম বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কটি প্রতিফলিত করে। উৎপাদনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করে চললেও পুঁজিপতিশ্রেণী উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা টিকিয়ে রেখে উৎপাদন-শক্তিসমূহের অবাধ বিকাশে বাধা হিসেবে কাজ করে। এই বাধা অপসারণের জন্য পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসান ও ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটানো আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ফলে শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে তাকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য পুঁজিবাদী শ্রেণীকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পথ সুগম করে।

মার্ক্স-এর আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উৎপাদন পদ্ধতির মালিকানার ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণী এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। তাঁর মতে, শ্রম হলো উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি। শ্রমিকের শ্রম থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত মালিক বা পুঁজিপতি শ্রেণী আত্মসাৎ করার কারণে শ্রমিক তার যথার্থ মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এ ব্যাপারে শ্রমিক যখন সচেতন হয়, তখনই দু'য়ের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, বিবদমান শ্রেণীগুলোর মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হতে বাধ্য, কারণ একটি শ্রেণীর উত্থান অপর শ্রেণীর অবনতি ঘটায়। এ পরস্পর বিরোধী শ্রেণীস্বার্থ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামকে অনিবার্য করে তোলে। এ শ্রেণী-সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হলো সামাজিক বিপ্লব (Social revolution)। মার্ক্স মনে করেন, সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়েই এ ধরনের পরস্পর বিরোধী দুটি শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আদিম সামবাদী সমাজে ব্যক্তির একার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব ছিল। ফলে সহযোগিতার মাধ্যমে তারা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণেই উৎপাদন-শক্তি সামাজিক রূপ লাভ করে। উৎপাদন-শক্তির ক্রমোন্নতির

ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব হলে সমাজের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে তা জোরপূর্বক আত্মসাৎ করার প্রবণতা দেখা দেয়। এভাবেই সম্পত্তির উপর ব্যক্তি মালিকানার আবির্ভাব ঘটে। অর্থাৎ বিকাশমান উৎপাদন-শক্তির চরিত্র সামাজিক হলেও উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র হয়ে পড়ে ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকেরা প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। কিন্তু প্রযুক্তিগত ক্রমিক উন্নয়নের ফলে স্থিতিশীল উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে গতিশীল উৎপাদন-শক্তির সংঘাত ও বিরোধ তৈরী হয়। এই বিরোধ ও সংঘাতের ফলে পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং উৎপাদন-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে। এভাবে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা সমূলে উচ্ছেদ না হলেও উৎপাদন সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এ বিষয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের বিভিন্ন রচনায় তুলে ধরেছেন যে, দাস সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক পরিবর্তিত হয়ে পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটে এবং এর পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বই শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে এবং যার অবসান ঘটবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নিচে চিত্রে মাধ্যমে বিষয়টিকে তুলে ধরা হলো–

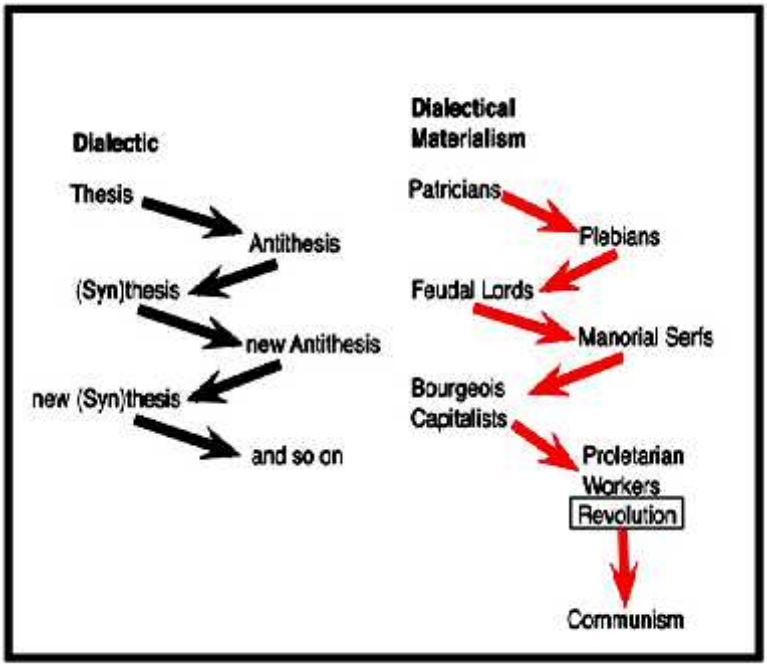

Dhaka University Institutional Repository

৫। কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা

প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে তাকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য পুঁজিবাদী শ্রেণীকে উৎখাত করে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের পথ সুগম করে। কমিউনিস্ট সমাজ হলো সার্বজনীন শ্রম, সার্বজনীন কলকারখানা, সার্বজনীন ভূমি এবং সমান অধিকার, কর্তব্যে অধিকার এবং শ্রেণীহীন সমাজ। আর এসব মিলে হলো কমিউনিজম। ১৯২০ সালের ৫ অক্টোবর রাশিয়ান যুব কমিউনিস্ট লীগের (The Russian Young Communist League) তৃতীয় কংগ্রেসের The Tasks of The Youth Leagues বক্তৃতায় লেনিন বলেন, "কমিউনিস্ট সমাজ হলে এমন একটি সমাজ যেখানে সমস্তকিছু–ভূমি, শিল্পকারখানা–সাধারণ মালিকানার এবং জনগণের শ্রম সাধারণী। এই হলো কমিউনিজম।"[১] কমিউনিজম হলো উৎপাদন উপায়ের উপর সামাজিক মালিকানাভিত্তিক একটি সামাজিক গঠনরূপ, যা উৎপাদন-শক্তিগুলোকে বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ তৈরি করে। এটি হলো মানবজাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রগতির সর্বোচ্চ পর্যায়। কমিউনিজমের দুটি স্তর আছে। যথা:

১. নিম্নতর স্তর → সমাজতন্ত্র এবং

২. উচ্চতর স্তর → সম্পূর্ণ কমিউনিজম

১. নিম্নতর স্তর → সমাজতন্ত্র

কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার নিম্নতর স্তরে উৎপাদনের উপায়ে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হলো এর অর্থনৈতিক ভিত্তি। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মানুষে মানুষে শোষণের উৎখাত ঘটে; বিলোপ ঘটে শ্রেণী, অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্ব এবং উন্মুক্ত হয় উৎপাদন শক্তির পরিকল্পিত বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের পূর্ণতর রূপ। সমাজতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য হলো জনগণের সচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সমাজের প্রতিটি মানুষের সার্বিক বিকাশ। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি হলোঃ 'প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে শ্রম অনুযায়ী'।

---

[১] Communist society is a society in which all things—the land, the factories—are owned in common and the people work in common. That is communism. V. I. Lenin ; *The Tasks of The Youth Leagues*, V. I. Lenin Collected works; Volume 31, (Moscow : Progress Publishers, 1974), p. 296.

২. উচ্চতর স্তর → সম্পূর্ণ কমিউনিজম

কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থার উচ্চস্তরে শ্রম অনুসারে বণ্টন ছেড়ে সমাজ এগিয়ে যাবে চাহিদা অনুযায়ী বণ্টনের দিকে। সম্পূর্ণ কমিউনিজমের মূলনীতি হলো 'প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে চাহিদা অনুযায়ী। এই স্তরে শ্রেণী লোপ পেয়ে মানুষের সম্পূর্ণ সামাজিক সমতায় সমাজ শ্রেণীহীন হয়ে উঠবে। তাইতো কমিউনিজমের অর্ত হলো প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রকৃতি, শর্তাবলি আর এ অনুসারে সংগ্রামের সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।[১]

১.৫ অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিসৌধ

উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সমাজের ঐতিহাসিক চরিত্র নির্ধারিত হয়। কিন্তু উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিশ্লেষণ এবং এদের পারস্পারিক সম্পর্কের মিথস্ক্রিয়া ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরতে পারে না। এর জন্য ভিত্তি ও উপরিসৌধ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ইতিহাসে সকল সমাজেরই একটি ভিত্তি এবং একটি উপরিসৌধ থাকে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো হলো ভিত্তি এবং সমাজের মানুষের চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণা হলো উপরিসৌধ। অর্থাৎ মানুষের বস্তুগত জীবন বা উৎপাদন পদ্ধতি হলো ভিত্তি এবং মানুষের চেতনালব্ধ বিষয়গুলো হলো উপরিসৌধ। ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মীয়, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভিন্ন প্রকার ধ্যানধারণা এবং এদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে উপরিসৌধ বলা হয়। স্তালিন (J. V. Stalin) তাঁর '*Dialectical and Historical Materialism*' নামক পুস্তিকায় বলেন,

> "The superstructure is the political, legal, religious, artistic, philosophical views of society and the political, legal and other institutions corresponding to them."[২]

---

[১] ...Communism now no longer meant the concoction, by means of the imagination, of an ideal society as perfect as possible, but insight into the nature, the conditions and the consequent general aims of the struggle waged by the proletariat. Fredrick Engels, *On The Hisrory of Communist League,* Karl Marx and Fredric Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* p. 179.

[২] J. V. Stalin, *Selected Works,* Volume One, Prometheus Publishing House, Kolkata, 2012, p. 263.

মার্ক্স-এর মতে, প্রতিটি সমাজই একটি বস্তুগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বস্তুগত ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের এই বস্তুগত ভিত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিভিন্ন ধরনের উপরিসৌধ। সমাজের আদর্শগত দিক বা চেতনাগত দিক হলো উপরিসৌধের একটি প্রধান বিষয়। এই বিষয়টি নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো–

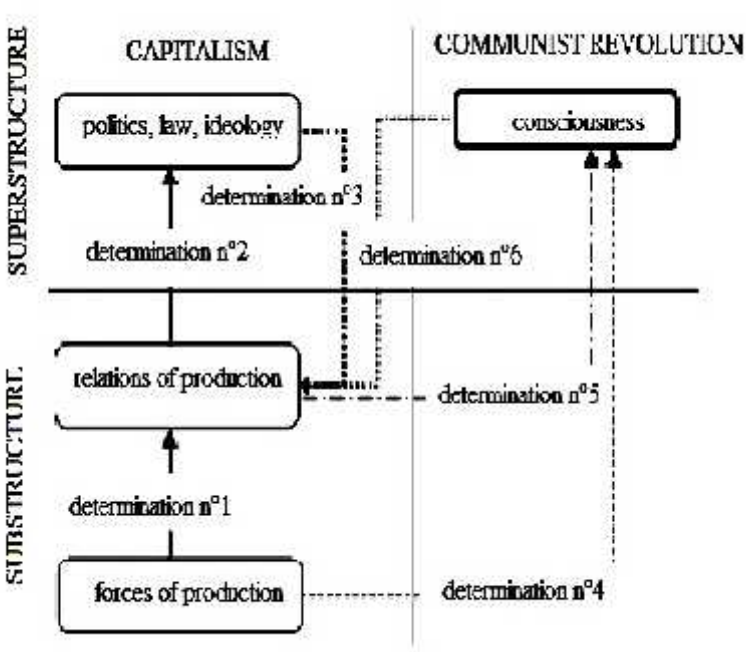

মার্ক্স ভিত্তি ও উপরিসৌধের ধারণার সাহায্যে সমাজ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত সৌধের সাথে তুলনা করেছেন। সৌধ যেমন তার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি মানুষের চিন্তন, মনন তথা মানুষের মতাদর্শগত জগৎ সমাজের বস্তুগত জীবন তথা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই বস্তুগত জীবনের শর্তগুলোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমানুপাতিক হারে সমাজ জীবনের চিন্তন ও মনন কাঠামোর পরিবর্তন সূচিত হয়। অর্থাৎ ভিত্তির পরিবর্তন সূচিত হলে উপরিসৌধেও পরিবর্তন সূচিত হয়। কারণ প্রতিটি ভিত্তিরই একটি উপযুক্ত উপরিসৌধ থাকে।

অর্থনৈতিক ভিত্তি ও উপরিসৌধ ধারণা সম্পর্কে কানিসবার্গ (Kunigsberg)-এর জে. ব্লক (J. Bloch) সমীপে এঙ্গেলস একটি পত্রে (লন্ডন, ২১/২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০) উল্লেখ

করেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হলো ভিত্তি, কিন্তু উপরিসৌধের বিভিন্ন বস্তু যেমন, শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলো এবং তার ফলাফল সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, বিচার ব্যবস্থা, এমনকি যোগদানকারীদের মস্তিষ্কে এই সমস্ত বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলি, ধর্মীয় মতামত এবং ক্রমে সেগুলোর আপ্তবাক্যে পরিণতি, এসবও ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলোর গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে উঠে। এঙ্গেলস বলেন,

> The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure–political forms of the class struggle and its results, to wit: constitutions established by the victorious class after a successful battle, etc., juridical forms, and even the reflexes of all these actual struggles in the brains of the participants, political, juristic, philosophical theories, religious views and their further development into systems of dogmas–also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases preponderate in determining their forms.[১]

উপরিসৌধ হলো একটি অত্যন্ত জটিল সামাজিক গঠন। কারণ ভিত্তি ও উপরিসৌধের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে কোন বিরতি থাকে না। বিভিন্ন যুগে সমাজের উপরিসৌধের চরিত্র পরিবর্তিত ও বিকশিত হয় এবং এর পিছনে বিভিন্ন উপাদান কাজ করে। উপরিসৌধ গঠনে যেসমস্ত উপাদান কাজ করে তাদের মধ্যে অবিরাম মিথস্ক্রিয়া চলে। তবে উপরিসৌধ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে না। অর্থাৎ, উৎপাদন-শক্তি সরাসরি উপরিসৌধের চরিত্র নির্ধারণ করে না। উৎপাদন-শক্তি সরাসরিভাবে উৎপাদন সম্পর্ককে নির্ধারণ করে এবং ক্রমে ক্রমে উৎপাদন সম্পর্ক উপরিসৌধকে প্রভাবিত করে। যেহেতু উৎপাদন-শক্তির চরিত্র হলো শ্রেণী নিরপেক্ষ সেহেতু উৎপাদন শক্তির প্রকৃতি মূলত এক হলেও উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্রগত পার্থক্যের কারণে দুটি ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় উপরিসৌধ পরস্পর বিরোধী হয়। যেমন- সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার পরস্পর বিরোধী উপরিসৌধর উপস্থিতি মূলগতভাবে ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্কের ফল হিসেবে বর্ণনা করা যায়। অতএব, অর্থনীতি ও ভিত্তির মাধ্যমে উপরিসৌধ

---

[১] Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* p. 487.

উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। সমাজের সকল ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা এবং এর সম্পর্কিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে উপরিসৌধ গঠিত হয়। এজন্যই উপরিসৌধের মধ্যে শাসক ও শোষিত উভয়ের চিন্তা-ভাবনা স্থান পেয়ে থাকে। তবে সমাজের ভিত্তির উপরে উপরিসৌধের সব সময় একই রকম হয় না। এটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আকার ধারণ করে থাকে। যেমন- শ্রেণী সমাজে উপরিসৌধ শ্রেণী চরিত্র বহন করে থাকে। সমাজে একাধিক শ্রেণী এবং তাদের চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শ পাশাপাশি অবস্থান করে। কিন্তু যে শ্রেণী সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে সেই শাসক শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনাই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। অর্থাৎ, শাসক শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শই হলো উপরিসৌধের প্রকৃত ভাবধারা।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভিত্তি থেকেই উপরিসৌধের জন্ম এবং ভিত্তি ও উপরিসৌধের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তবে বৈরী সমাজে ভিত্তি ও উপরিসৌধের সম্পর্ক বৈরী হতে পারে। সমাজের উৎপাদন-শক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কও পরিবর্তিত ও বিকশিত হয় এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তিও পরিবর্তিত ও বিকাশিত হয়। তবে সমাজের ভিত্তি যত সহজে ও দ্রুত পরিবর্তিত ও বিকশিত হয় তত সহজে উপরিসৌধের পরিবর্তন ও বিকাশ হয় না। মানুষের সামাজিক অগ্রগতির ঐতিহাসিক প্রয়োজনে উৎপাদন-শক্তির বিকাশ ঘটে। পুরনো উৎপাদন সম্পর্কের ধ্বংস হয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পুরনো উপরিসৌধ নতুন উৎপাদন-শক্তি ও ভিত্তিকে কিছু সময় নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং এই নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীন সময়ে সংঘর্ষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ভিত্তি ও উপরিসৌধের মধ্যে সংঘর্ষ কোন একটি সময়ে শ্রেণী সংঘর্ষে রূপ নিয়ে থাকে। যেহেতু অর্থনৈতিক ভিত্তিই হলো উপরিসৌধের উৎস, সেহেতু ভিত্তির পরিবর্তন ও বিকাশ উপরিসৌধের পরিবর্তন ও বিকাশ সুনিশ্চিত করে।

আবার সমাজের উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ও বিকাশ দ্বারা উপরিসৌধের পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে থাকে। সমাজজীবনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি উপরিসৌধে শ্রেণী সম্পর্কে প্রতিফলন ঘটে থাকে। ফলে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধগুলো উপরিসৌধে (বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি) প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যেমন- পুঁজিবাদী সমাজের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে সে সমাজের শ্রম ও পুঁজির পরস্পর বিরোধী সম্পর্কের প্রতিফল ঘটে থাকে। কারণ পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর নিজ নিজ স্বার্থের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ গড়ে উঠে।

১.৬ উপরিসৌধঃ রাষ্ট্র, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন

মার্ক্স-এর মতে, মানব জীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ জড়িত হয় কতকগুলো অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কে, যা মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। এই উৎপাদনগুলোর সমষ্টিই হলো সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, যার উপর আইনগত, রাজনৈতিক ধর্মগত, নন্দনতত্ত্বগত বা দার্শনিক উপরিসৌধ গড়ে উঠে। নিচে চিত্রের সাহায্যে ভিত্তি ও উপরিসৌধ সম্পর্ক তুলে ধরা হলো–

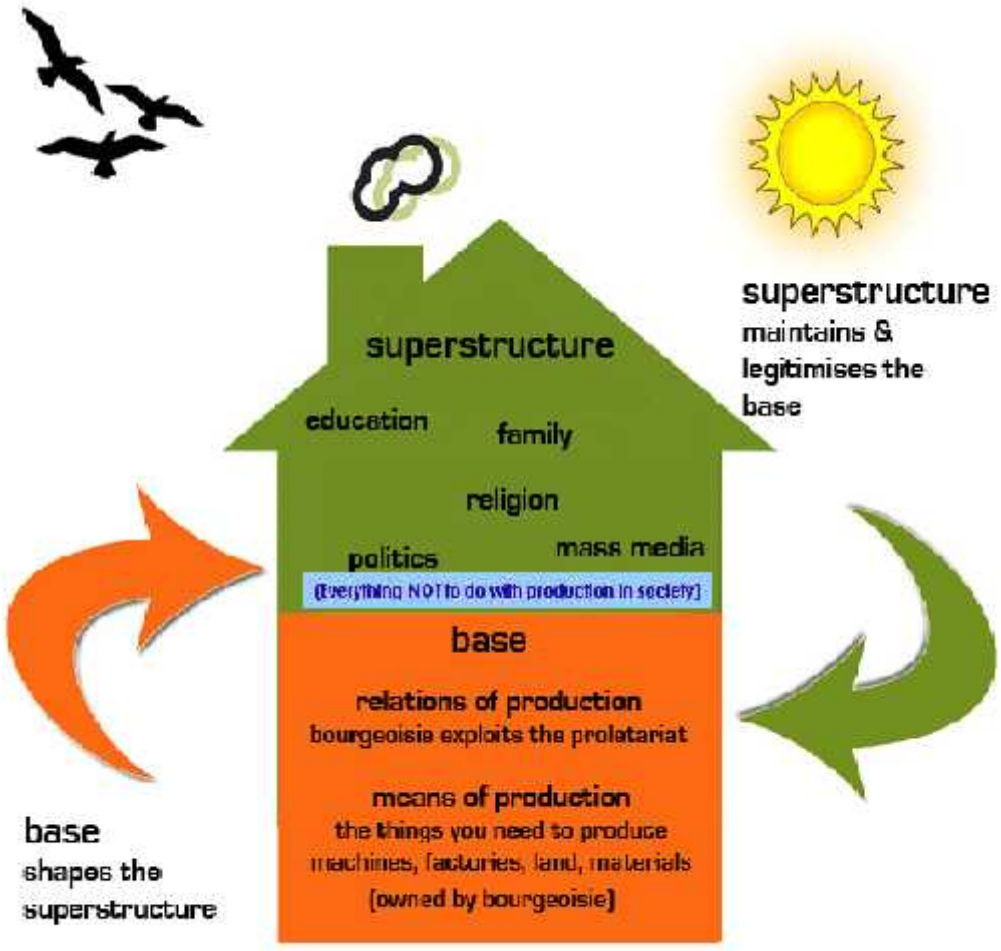

বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণত মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে থেকে এত যে

উৎপাদন-শক্তি সক্রিয় ছিল তারই সঙ্গে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এই সম্পর্ক উৎপাদন-শক্তি বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে উৎপাদন-শক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। এখান থেকেই শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের একটি যুগ। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উপরিসৌধও কমবেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে যায়। মার্ক্স তাঁর '*A Contribution to the Critique of Political Economy*' গ্রন্থের মূখবন্ধে (Preface) বলেন,

> In the social production of their existence, men inevitably enter into definite relations, which are independent of their will, namely relations of production appropriate to a given stage in the development of their material forces of production. The totality of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which arises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. ... The changes in the economic foundation lead sooner or later to the transformation of the whole immense superstructure. In studying such transformations it is always necessary to distinguish between the material transformation of the economic conditions of production, which can be determined with the precision of natural science, and the legal, political, religious, artistic or philosophic – in short, ideological forms in which men become conscious of this conflict and fight it out.[১]

এঙ্গেলস-এর মতে, মানুষের আদিম অবস্থার পর থেকে সমস্ত ইতিহাস হলো শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। প্রত্যেকটি সমাজের সংগ্রামরত শ্রেণীগুলো হলো উৎপাদন সম্পর্ক ও বিনিময় সম্পর্কের উৎপাদিত ফল। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি যুগের শ্রেণী-সংগ্রাম হলো সে যুগের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি। কারণ যে কোন সমাজের মূল ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর এই মূল ভিত্তি থেকেই উৎসারিত হয় সমাজের সমগ্র উপরিসৌধ। এই উপরিসৌধগুলো

[১] Karl Marx, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, *op. cit.,* pp. 20-21

হলো আইন, রাষ্ট্রীয় শাসন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দার্শনিক তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক যুগের বাকি সকল ধ্যান-ধারণা। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলস তাঁর '*Anti-Dühring*' (1877) গ্রন্থে বলেন,

> The new facts made imperative a new examination of all past history. Then it was seen that *all* past history was the history of class struggles; that these warring classes of society are always the products of the modes of production and of exchange — in a word, of the *economic* conditions of their time; that the economic structure of society always furnishes the real basis, starting from which we can alone work out the ultimate explanation of the whole superstructure of juridical and political institutions as well as of the religious, philosophical, and other ideas of a given historical period.[১]

মার্ক্স-এর মতে, সমাজের উৎপাদন শক্তির সঙ্গে বিনিময় সম্পর্কের রূপগত সম্পর্ক হলো মানুষের পেশা বা কর্মতাৎপরতার সঙ্গে বিনিময় সম্পর্কের রূপগত সম্পর্ক। মানুষের পেশা বা কর্মতৎপরতার মৌলিক রূপ অবশ্যই বস্তুগত যার উপর অন্যসকল উপরিসৌধ তথা মানসিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নির্ভরশীল। মার্ক্স ও এঙ্গলস তাঁদের '*The German Ideology*' গ্রন্থে বলেন,

> The relation of the productive forces to the form of intercourse is the relation of the form of intercourse to the occupation or activity of the individuals. (The fundamental form of this activity is, of course, material, on which depend all other forms - mental, political, religious, etc. The various shaping of material life is, of course, in every case dependent on the needs which are already developed, and the production, as well as the satisfaction, of these needs is an historical process, ...)[২]

মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*The German Ideology*' (1845–46) গ্রন্থে দেখান যে, উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে জীবনের বস্তুগত উপাদান থেকে শুরু করে এবং এই

---

১ Frederick Engels, *op. cit.,* 1976. p. 32.

২ Karl Marx and Fredrick Engels*, The German Ideology*, Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* pp. 69.

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিময় সম্পর্কের রূপ ও উৎপাদন পদ্ধতির সামগ্রিক উপলব্ধি থেকে। এই সামগ্রিক উপলব্ধিই হলো সকল ইতিহাসের ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে রাষ্ট্রের ক্রিয়া, নানা ধরনের তাত্ত্বিক বিষয়, চেতনার স্বরূপ, ধর্ম, দর্শন, নৈতিকতা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেন,

> This conception of history depends on our ability to expound the real process of production, starting out from the material production of life itself, and to comprehend the form of intercourse connected with this and created by this mode of production (i.e. civil society in its various stages), as the basis of all history; and to show it in its action as State, to explain all the different theoretical products and forms of consciousness, religion, philosophy, ethics, etc. etc. and trace their origins and growth from that basis; by which means, of course, the whole thing can be depicted in its totality (and therefore, too, the reciprocal action of these various sides on one another).[১]

মার্ক্স-এর মতে, উৎপাদনের প্রত্যেকটি বিশেষ ধরন এবং তার অনুষঙ্গী সামাজিক সম্পর্ক অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোটিই হলো প্রকৃত ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরে গড়ে তোলা হয় সমাজের আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিসৌধ এবং এর সঙ্গে চিন্তার নির্দিষ্ট সামাজিক রূপগুলোর সংগতি থাকে। কাজেই উৎপাদন পদ্ধতিই সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের চরিত্র নির্ধারণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স তার '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের টীকাভাষ্যে বলেন,

> In the estimation of that paper, my view that each special mode of production and the social relations corresponding to

---

[১] Karl Marx and Fredrick Engels, *The German Ideology*, Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 5, *op. cit.,* pp. 53.

> it, in short, that the economic structure of society, is the real basis on which the juridical and political superstructure is raised and to which definite social forms of thought correspond; that the mode of production determines the character of the social, political, and intellectual life generally, all this is very true for our own times, in which material interests preponderate, but not for the middle ages, in which Catholicism, nor for Athens and Rome, where politics, reigned supreme.[১]

যেহেতু উপরিসৌধ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হয় সেহেতু যতদিন পুরনো ভিত্তিটি অপরিবর্তিত থাকে ততদিন পর্যন্ত উপরিসৌধও অপরিবর্তিত থাকে। পুরনো ভিত্তিকে ভেঙ্গে নতুন ভিত্তি গড়ে উঠার প্রক্রিয়ায় নতুন উপরিসৌধের বিকাশ শুরু হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, মতাদর্শ, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, আইন ইত্যাদি উপরিসৌধ আকস্মিকভাবে জন্ম লাভ করে না। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে শ্রেণী সম্পর্কে জন্ম দিয়ে থাকে তার সঙ্গে উপরিসৌধের সম্পর্ক কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

১.৭ শ্রেণী, শ্রেণী-বিভাজন ও শ্রেণী-সংগ্রাম

সাধারণত একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সমাজের এ ধরনের এক একটি অংশ হলো এক একটি শ্রেণী। সমাজ জীবন সম্পর্কিত মার্ক্সীয় দর্শনের মৌলিক ও কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে শ্রেণীর ধারণা। মার্ক্স-এর চিন্তাধারতেই প্রথম সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণী ধারণাটিকে মানব চরিত্রের একটি মৌলিক ধারণা তথা সমাজের বিষয়গত কাঠামো হিসেবে উৎপাদন পদ্ধতিতে সূত্রবদ্ধ হয়। তাঁর মতে শ্রেণী হলো নির্দিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের একটি দিক এবং এই সম্পর্ক তৈরি হয় উৎপাদনের উপায় তথা সম্পত্তিতে মালিকানার সম্পর্কের মাধ্যমে। অর্থাৎ, মার্ক্স উৎপাদন সম্পর্ক বলতে শ্রেণী সম্পর্ককে তথা পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক এবং ভূমি মালিক ও কৃষকের সম্পর্ককে বুঝিয়েছেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক নয়।

---

[১] Karl Marx, *Capital,* Volume One, *op. cit.,* p. 55.

মার্ক্স শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেননি। তবে মার্ক্স-এর প্রধান রচনাগুলোতে বিশেষ করে '*Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*'; '*Preface to a Contribution of the Critique of Political Economy*'; '*Capital*'; '*Manifesto to the Communist Party*', '*The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*' এবং '*The German Ideology*' গ্রন্থে শ্রেণীর উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে মার্ক্স শ্রেণীর ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, উৎপাদন পদ্ধতিই জনগণকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে। এই উৎপাদন পদ্ধতিই জনগণের মধ্যে বৈরী সামাজিক অবস্থান বা সম্পর্ক তৈরি করে এবং তা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়। ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স শ্রেণীর ধারণাকে স্পষ্ট করেন। এক্ষেত্রে তিনি মজুরি শ্রমিক, পুঁজিপতি এবং ভূমি মালিক–এই তিনটি বৃহৎ সামাজিক শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শ্রেণী হলো তিনটি বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠী যার সদস্যরা (ব্যক্তিবর্গ) যথাক্রমে মজুরি শ্রম, মুনাফা এবং খাজনা থেকে জীবনধারণ করে। মার্ক্স-এর মতে, লক্ষ লক্ষ পরিবার এমন আর্থিক পরিবেশের মধ্যে থেকে জীবনযাপন করে এবং এমন স্বার্থ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে যা অন্যদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও স্বার্থ কেবল স্বতন্ত্র নয়, বিপরীতও বটে। এই সকল পরিবারকে নিয়ে একটি শ্রেণী গঠিত হয়। কিন্তু একই ধরনের অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করেও যদি কোন প্রকার সংগঠন গড়ে তুলতে না পারা যায় অথবা জনগণ নিজেদের মধ্যে বন্ধন স্থাপন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সেই সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে শ্রেণী গঠিত হতে পারে না।[১] শ্রেণী সম্পর্ক থেকেই শ্রেণী সমাজ এবং শ্রেণী মানুষ গড়ে উঠে। শ্রম শোষণ তথা উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাতের মধ্য দিয়ে শ্রেণী সমাজ গড়ে উঠে। আর শ্রেণী স্বার্থ নির্ধারিত হয় উৎপাদন পদ্ধতিতে এর অবস্থান ও ভূমিকা দিয়ে। উৎপাদনের উপায় তথা সম্পত্তিতে মালিকানা দিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করা হয়। সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা থেকে তৈরি হয় বৈরী সামাজিক সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কের এ প্রক্রিয়া থেকেই মার্ক্স-এর শ্রেণী ধারণা খুঁজে পাওয়া যায়। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*The German Ideology*' গ্রন্থে বলেন, যে

---

[১] "Insofar as millions of families live under economic conditions of existence that separate their mode of life, their interests and their culture from those of the other classes, and put them in hostile opposition to the latter, they form a class. Insofar as there is merely a local interconnection among these small-holding peasants, and the identity of their interests begets no community, no national bond and no political organisation among them, they do not form a class." Karl Marx; *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte;* Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 11, *op. cit.,* pp. 187.

বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শ্রেণী তখনই গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হবে যখন তারা অন্য একটি শ্রেণীর (তৃতীয় শ্রেণীর) বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনা করবে। ভিন্ন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ এই নয় যে একই শ্রেণীর সদস্যরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে না। ব্যক্তি স্বতন্ত্র হলেও এদেরকে নিয়ে গঠিত শ্রেণীর কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা থাকবেই।[১] লেনিন বলেন,

> শ্রেণী বলা হয় জনগণের এমন সব বড় বড় গোষ্ঠীকে, যারা সামাজিক উৎপাদনের ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় তাদের স্থান, উৎপাদনের-উপায়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনে নিবদ্ধ ও সংহত), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা, এবং সেইহেতু সামাজিক ঐশ্বর্যের যে অংশটা তারা ভোগ করে তা পাওয়ার পদ্ধতি ও আয়তন অনুসারে পরস্পর পৃথক। শ্রেণী হলো এমন সব জনগোষ্ঠী যাদের একদল সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় নিজেদের বিভিন্ন স্থানের দৌলতে অপর দলের শ্রম আত্মসাৎ করতে পারে।[২]

মার্ক্স-এর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শ্রম বিভাজনের ফল হিসেবে সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়। তিনি পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ করে বলেন, পুঁজিবাদী সমাজ বিকাশের নিয়মটাই হলো পুঁজিপতির হাতে সম্পত্তি পুঞ্জীভূত হওয়া। অর্থাৎ, সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে মালিকানার ব্যক্তিগত চরিত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। এ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই সামাজিক শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা

---

[১] It follows from all we have been saying up till now that the communal relation into which the individuals of a class entered, and which was determined by their common interests as against a third party, was always a community to which these individuals belonged only as average individuals, only insofar as they lived within the conditions of existence of their class—a relation in which they participated not as individuals but as members of a class. Karl Marx and Frederick Engels, *The German Ideology,* Karl Marx and Frederick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 80.

[২] Classes are large groups of people differing from each other by the place they occupy in a historically determined system of social production, by their relation (in most cases fixed and formulated in law) to the means of production, by their role in the social organisation of labour, and, consequently, by the dimensions of the share of social wealth of which they dispose and the mode of acquiring it. Classes are groups of people one of which can appropriate the labour of another owing to the different places they occupy in a definite system of social economy. V. I. Lenin ; *A Great Beginning,* V. I. Lenin Collected works; Volume 29, Progress Publishers; Moscow; 1974, p. 421.

শ্রেণী-বিভাজনের মূল কারণ। মার্ক্স-এর মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার অনিবার্য ফল হলো অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে পুঁজি সঞ্চিত হয় এবং এভাবে পুঁজির আধিপত্যের এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এভাবে গোটা সমাজ সম্পত্তি মালিক ও সম্পত্তিহীন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ মার্কস-এর মতে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত এই দুই বৃহৎ পরস্পর বিরোধী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।[১]

ইতিহাসের ধারায় এবং সমাজ বিকাশের পথে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে শ্রেণী-সংগ্রাম। সমাজ জীবনের মূলক্ষেত্র তথা রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। শ্রেণী-সংগ্রামের কাজ হলো বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য কায়েম করা। তাইতো শ্রেণী-সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপ হলো রাজনৈতিক সংগ্রাম। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) নামক সাড়া জাগানো পুস্তিকার ১৮৮৩ সালের জার্মান সংস্করণের (The 1883 German Edition) ভূমিকায় শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে এঙ্গেলস তাঁর বন্ধু মার্ক্স-এর চিন্তাধারাকে অতি অল্পকথায় তুলে ধরেন। এঙ্গেলস-এর মতে, প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক উপাদান এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে উদ্ভূত সমাজ-কাঠামোর গঠন সেই যুগের রাজনীতি ও বৌদ্ধিক চিন্তাধারার ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে। এইজন্যই সমস্ত ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস — এ সংগ্রাম শোষিত ও শোষণকারী শ্রেণীর মধ্যে, সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রভুত্বচালিত ও প্রভুত্বকারী শ্রেণীর মধ্যে। তাঁর মতে, এই সংগ্রাম আজ এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছেছে যেখানে শোষিত ও অত্যাচারিত শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত শ্রেণী) শুধু নিজেকে শোষণ ও অত্যাচারীর (বুর্জোয়া শ্রেণী) হাত থেকে মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হলে সমস্ত সমাজকেই

---

[১] Society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other: Bourgeoisie and Proletariat. Karl Marx; '*Manifesto of the Communist Party;* Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 6, *op. cit.,* p. 485.

শোষণ, অত্যাচার ও শ্রেণী-সংগ্রামের হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করতে হবে। আর এই ধরনের চিন্তা একমাত্র ও সম্পূর্ণভাবেই কার্ল মার্ক্স-এরই বলে এঙ্গেলস মনে করেন। এঙ্গেলস বলেন,

> The basic thought running through the Manifesto — that economic production, and the structure of society of every historical epoch necessarily arising therefrom, constitute the foundation for the political and intellectual history of that epoch; that consequently...all history has been a history of class struggles, of struggles between exploited and exploiting, between dominated and dominating classes at various stages of social evolution; that this struggle, however, has now reached a stage where the exploited and oppressed class (the proletariat) can no longer emancipate itself from the class which exploits and oppresses it (the bourgeoisie), without at the same time forever freeing the whole of society from exploitation, oppression, class struggles — this basic thought belongs solely and exclusively to Marx.[১]

মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) পুস্তিকাটি রচনার ক্ষেত্রে একশত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় ধরে অত্যন্ত প্রতিভাদীপ্ত স্পষ্টতার স্বাক্ষর বহন করে আছে। যে রাজনীতি, দর্শন, সমাজনীতি এই ছোট রচনার মধ্যে স্ফুরিত হয়েছে তা আজও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে উদ্দীপিত করে তুলেছে। এ রচনায় মূর্ত হয়ে আছে নতুন বিশ্বদৃষ্টি, সমাজের গভীর এলাকা পর্যন্ত প্রসারিত সুসংগত বস্তুবাদ, বিকাশের সর্বাপেক্ষা

[১] K. Marx and F. Engels, *Manifesto of the Communist Party,* Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 100.

গভীর মতবাদস্বরূপ দ্বন্দ্বতত্ত্ব, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং কমিউনিস্ট[1] সমাজের স্রষ্টা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবতত্ত্বের ভূমিকা। ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এ রচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে মানুষ কিভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং এই উৎপাদন সম্পর্ক কিভাবে মানুষের ধ্যান-ধারণা তথা সমস্ত সামাজিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) পুস্তিকাটির প্রথম অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উৎপাদন ব্যবস্থার বস্তুগত উপকরণকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠে তাই হলো সমাজের মূল কাঠামো। সমাজের এই মূল কাঠামোর উপরই সামাজিক সম্পর্কের অন্য সমস্ত দিকগুলো গড়ে উঠে। সমাজের এই কাঠামো বা উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সবকিছুই উৎপাদন সম্পর্কে সঙ্গে সংগতি রেখে বিকশিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। শ্রেণীসমাজে শোষকশ্রেণীই রূপান্তরিত হয় শাসকশ্রেণীতে। এজন্যই শোষকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ভাবধারার অনুশাসনেই সমগ্র সামাজিক ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) পুস্তিকায় বলেন, ঐতিহাসিক বিচারে বুর্জোয়া শ্রেণী খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থা মানুষের পণ্য উৎপাদন ক্ষমতাকে আকাশচুম্বী করেছে। বুর্জোয়া

---

[১] কমিউনিস্টরা হলো একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ — যে অংশ অন্যান্য সকলকে সামনে নিয়ে যায়। তাত্ত্বিক দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশের তুলনায় তাদের সুবিধা এই যে, শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত ও শেষ সাধারণ ফলাফল সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে। কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য হলো- প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসেবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্য বিস্তার করা, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা। (The Communists, therefore, are on the one hand, practically, the most advanced and resolute section of the working-class parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement. The immediate aim of the Communists is the same as that of all other proletarian parties: formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat.) মিলিয়ে দেখুন, *Ibid,* p. 120.

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও নির্দোষ সরল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েছে। যেসব বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ তাদের স্বাভাবিক ঊর্ধ্বতনদের কাছে বাঁধা ছিল সেসব বাঁধন এরা নির্মমভাবে ছিঁড়ে ফেলেছে। মানুষ আর মানুষের নগ্ন স্বার্থের সম্পর্ক ছাড়া, নির্বিকার নগদ লেনদেনের বাঁধন ছাড়া কোন বন্ধনই অবশিষ্ট রাখেনি। আত্মসর্বস্ব হিসাবনিকাশের হিমশীতল বরফ জলে এরা ডুবিয়ে মেরেছে ধর্মীয় উন্মাদনার অতি দিব্য ভাবোচ্ছ্বাসকে, শৌর্যমণ্ডিত উৎসাহ আর কূপমণ্ডূক ভাবালুতাকে। ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে এরা বিনিময় মূল্যে পরিণত করেছে। অসংখ্য অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার জায়গায় এরা খাড়া করেছে একটিমাত্র ব্যবস্থার স্বাধীনতা — তা হলো বিবেকশূন্য অবাধ বাণিজ্যের স্বাধীনতা। এককথায়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মোহে অবগুণ্ঠিত শোষণের জায়গায় এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ পাশবিক শোষণ। মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, যাকে সশ্রদ্ধ ভীতিপূর্ণ মর্যাদার চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী তার সবকিছুর মাহাত্মই শেষ করে দিয়েছে। চিকিৎসক আইনজীবী, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী–সকলকেই এরা পরিণত করেছে নিজেদের বেতনভুক্ত মজুরি-শ্রমিকে।[১]

ইতিহাসের গতিধারা বিশ্লেষণ করে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) রচনায় দেখিয়েছেন, আজ পর্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় মানবসমাজ তথা মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক পরস্পর বিরোধী স্বার্থযুক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। এই পরস্পর বিরোধী শ্রেণীগুলোর সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) রচনায় দেখিয়েছেন, সমাজ বিকাশের ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষ সৃষ্টি করে না। উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা শ্রেণীগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংগ্রামই হলো বিকাশের নিয়ন্তা। উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বিদ্যমান তাই মানুষের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়ে পরস্পর বিরোধী ভাবধারার জন্ম দিয়ে থাকে। এই শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দিয়ে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে কোন বিমূর্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ এবং সেইসঙ্গে শ্রেণী শোষণ ও শাসনের অবসান করতে শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে আপসহীন

---

[১] The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part. The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations. ... The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honoured and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage labourers. মিলিয়ে দেখুন, *Ibid,* p. 111.

শ্রেণী-সংগ্রামের পথ নির্দেশ করেছে মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) রচনাটি। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাঁরা অগ্রগামী তাঁদেরকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল ধরনের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে কমিউনিস্টরা সব সময়ই সমর্থন জানাবে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) রচনায় বলেন, শ্রমিকশ্রেণীর আশু লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করে। আন্দোলনের বর্তমান অবস্থার মধ্যেও তারা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সজাগ থাকে। কমিউনিস্টরা ফ্রান্সের রক্ষণশীল এবং র‍্যাডিকাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মেলায়। কিন্তু মহান ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে ঐতিহ্য হিসেবে যেসব বাঁধা বুলি ও বিভ্রান্তি চলে আসছে তার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের অধিকারটুকু বর্জন করে না। ... পোল্যান্ডে তারা সমর্থন করে সেই দলটিকে যারা জাতীয় মুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে কৃষি বিপ্লবের উপর জোর দেয়, যে দল ১৮৪৬ সালে ক্রোকেভ বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়েছিল।[১] এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) নামক পুস্তিকাটি প্রকাশের একশত পঞ্চাশ বছরের বেশি সময় পরেও এই নীতি সারা বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে কমিউনিস্টদের সংগ্রামের নীতি নির্ধারণে আজও অনিবার্যভাবে কার্যকর ও সহায়ক।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শোষণের চরিত্রটি সুস্পষ্ট করে আলোচনা করেছেন। সমকালীন অবস্থাকে ইতিহাসের গতিশীল প্রবাহের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে মার্ক্স ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের উভয় সংকটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের গতিপথকে তাঁরা পর্যায়ক্রমিক পণ্য উৎপাদন প্রণালি ও তজ্জনিত বিভিন্ন শ্রেণী আধিপত্যের প্রভাবজনিত সামাজিক প্রগতির অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, প্রতিটি যুগের অবস্থানগত পরিবর্তন নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সূচনা করেছে, অধিকতর উৎপাদনক্ষম সামাজিক শক্তির জন্ম

[১] The Communists fight for the attainment of the immediate aims, for the enforcement of the momentary interests of the working class; but in the movement of the present, they also represent and take care of the future of that movement. In France, the Communists ally with the Social-Democrats against the conservative and radical bourgeoisie, reserving, however, the right to take up a critical position in regard to phases and illusions traditionally handed down from the great Revolution. ... In Poland, they support the party that insists on an agrarian revolution as the prime condition for national emancipation, that party which fomented the insurrection of Cracow in 1846. মিলিয়ে দেখুন, *Ibid,* p. 136.

দিয়েছে, নতুন সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে। যেমন, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য অতি সরল গিল্ডপ্রথায় শিল্পোৎপাদন বা হস্তশিল্প কারিগরপ্রধান পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। কিন্তু পরবর্তী ধনতান্ত্রিক যুগে পুঁজিবাদী মালিকশ্রেণীর অধীনে বৃহৎ যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদনের মালিকানাচ্যুত নির্দিষ্ট বেতনে নির্দিষ্ট উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত শ্রমকশ্রেণী অধ্যুষিত সমাজ ব্যবস্থা।

'*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থের মাধ্যমে মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে বিষয়গুলো সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করেছেন সেই বিষয়গুলো মার্ক্স তাঁর '*Capital*' গ্রন্থের মাধ্যমে পুঁজিবাদের গতি প্রকৃতিতে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে যে সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে তা হলো- পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি পণ্যে রূপান্তরিত হয় এবং তা একটি নির্দিষ্ট বাজার মূল্যে বিক্রয় হয়। পুঁজিবাদী মালিক তাঁর পুঁজিকে বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করার জন্য শ্রমশক্তিরূপ পণ্য ক্রয় করে থাকে। মার্ক্স-এর মতে, পুঁজি হলো নতুন কাঁচামাল, নতুন শ্রমের হাতিয়ার, জীবনধারণের বিভিন্ন নতুন উপকরণ উৎপন্ন করার জন্য যত কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং জীবনধারণের জন্য যত রকমের উপকরণ নিয়োজিত হয় তার সমষ্টি। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স তাঁর '*Wage Labour and Capital*' (1847) গ্রন্থে বলেন,

> Capital consists of raw materials, instruments of labour, and means of subsistence of all kinds, which are employed in producing new raw materials, new instruments, and new means of subsistence. All these components of capital are created by labour, products of labour, accumulated labour. Accumulated labour that serves as a means to new production is capital.[১]

মার্ক্স তাঁর '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনাকালে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন এবং দেখান যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একদিকে থাকে পুঁজিপতি ও অন্যদিকে থাকে মজুরি-শ্রমিক। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক সূচনালগ্নে প্রত্যেক পুঁজিপতি ভুঁইফোঁড়কে ব্যক্তিগতভাবে একটি ঐতিহাসিক

---

[১] Karl Marx, *Wage Labour and Capital*, Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 159.

স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অতিরিক্ত ধন লাভ ও ধনী হওয়ার ইচ্ছাই হলো পুঁজিপতির প্রধান কামনা। মার্ক্স তাঁর '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থের চব্বিশ অধ্যায়ে বলেন,

> "At the historical dawn of capitalist production,— and every capitalist upstart has personally to go through this historical stage — avarice, and desire to get rich, are the rulling passions."[১]

মার্ক্স তাঁর '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থে বলেন, বহুকাল পূর্বে দুই ধরনের মানুষ ছিল। এক শ্রেণীতে ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী এবং অন্য শ্রেণীতে ছিল অলস ধূর্তের দল, যারা সর্বস্ব খুইয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতো। দেখা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর লোকেরা ধন সঞ্চয় করলো এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের শেষ পর্যন্ত গায়ের চামড়া ছাড়া বিক্রি করবার মতো আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। শুরু হলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য, প্রচুর পরিশ্রম সত্ত্বেও যাদের নিজেকে ছাড়া বিক্রি করার মতো আর কিছুই ছিল না। আর মুষ্টিমেয় লোকের ধন সম্পদ ক্রমাগত বেড়েই চললো, যদিও তারা বহুপূর্বেই কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি অবস্থার উদ্ভব হয়, যার একদিকে অর্থ-সম্পদ, উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারণের উপকরণের মালিকরা, যারা অপরের শ্রমশক্তি ক্রয় করে নিজেদের অধিকৃত মূল্যের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে উৎসুক এবং অপরদিকে স্বাধীন শ্রমিকের দল, যারা নিজেদের শ্রমশক্তির বিক্রেতা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পূর্বানুমিত বিষয় হলো শ্রমিকরা যে উপায়গুলোর সাহায্যে তাদের শ্রম কার্যকর করতে পারে সেই উপায়গুলোতে সমস্ত মালিকানা থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। যে মুহূর্তে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই মুহূর্ত থেকেই তা এই বিচ্ছিন্নতা চালু রাখে এবং ক্রমপ্রসারমান হারে পুনঃসৃষ্টি করে চলে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শ্রমিকের কাছ থেকে উৎপাদনের উপায়গুলোর অধিকার কেড়ে নিয়ে জীবনধারণের ও উৎপাদনের সামাজিক উপায়গুলোকে পুঁজিতে পরিণত করে এবং সাক্ষাৎ উৎপাদকদের মজুরি-শ্রমিকে পরিণত করে। কাজেই আদিম সঞ্চয়ন হলো উৎপাদককে তার উৎপাদনের উপায়গুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। মার্ক্স-এর মতে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিতর থেকেই পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠে। অর্থাৎ

---

[১] Karl Marx, *Capital : A Critique of Political Economy,* (Vol-1), Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 35, Progress Publishers, Moscow, 1980, p. 589.

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বিনাশের ফলেই পুঁজিবাদী সমাজের উপাদানগুলো মুক্তি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স তাঁর '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে বলেন,

> The capitalist system presupposes the complete separation of the labourers from all property in the means by which they can realize their labour. As soon as capitalist production is once on its own legs, it not only maintains this separation, but reproduces it on a continually extending scale. The process, therefore, that clears the way for the capitalist system, can be none other than the process which takes away from the labourer the possession of his means of production; a process that transforms, on the one hand, the social means of subsistence and of production into capital, on the other, the immediate producers into wage labourers. ... The economic structure of capitalist society has grown out of the economic structure of feudal society. The dissolution of the latter set free the elements of the former.[১]

মার্ক্স-এর মতে, যে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মজুরি-শ্রমিক এবং পুঁজিপতির বিকাশ, তার যাত্রাবিন্দু ছিল শ্রমিকের দাসত্ববন্ধন। এই দাসত্বের রূপ পরিবর্তন হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে পুঁজিবাদী শোষণে রূপান্তরের মাধ্যমে। তিনি তাঁর '*Capital*' (Volume One) গ্রন্থের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে বলেন,

> The starting point of the development that gave rise to the wage labourer as well as to the capitalist, was the servitude of the labourer. The advance consisted in a

[১] *Ibid,* pp. 705-706.

change of form of this servitude, in the transformation of feudal exploitation into capitalist exploitation.[১]

মার্ক্স-এর মতে, পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে দুটি সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্ব বিরাজমান, যার একদিকে রয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী এবং অন্যদিকে রয়েছে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী। পুঁজিপতি শ্রেণী হলো উৎপাদন ও জীবনধারণের উপায়ের মালিক। কিন্তু মালিকানা থেকে বাদ পড়ার কারণে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী মাত্র একটিই বিক্রয়যোগ্য পণ্যের অধিকারী এবং তা হলো তার শ্রমশক্তি। জীবনধারণের উপায়ের মালিকানা লাভ করার জন্য এই প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অবশ্য পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে নিহিত সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমের দ্বারা। অতএব, পণ্যটি পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কাজেই একদিনে বা মাসে বা বছরে একজন মানুষের শ্রমশক্তির গড় মূল্য নির্ধারিত হয় একদিনে বা মাসে বা বছরে এই শ্রম-শক্তিকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপায়ের পরিমাণের মধ্যে নিহিত শ্রমের পরিমাণের দ্বারা। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতির কাজে নিযুক্ত শ্রমিক পুনরুৎপাদন করে তার শ্রমশক্তির মূল্য, যে জন্য সে মজুরি বা বেতন পায়। কিন্তু শ্রমিক উদ্বৃত্ত মূল্যও উৎপাদন করে। পুঁজিপতি এই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং এই উদ্বৃত্তমূল্য থেকেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমশক্তি দ্বারা সকল সম্পদের উদ্ভব।[২]

---

[১] *Ibid,* p. 706.

[২] We have seen that the capitalist process of production is a historically determined form of the social process of production in general. The latter is as much a production process of material conditions of human life as a process taking place under specific historical and economic production relations, producing and reproducing these production relations themselves, and thereby also the bearers of this process, their material conditions of existence and their mutual relations, i.e., their particular socio-economic form. ... We saw also that capital — and the capitalist is merely capital personified and functions in the process of production solely as the agent of capital — in its corresponding social process of production, pumps a definite quantity of surplus-labour out of the direct producers, or labourers; capital obtains this surplus-labour without an equivalent, and in essence it always remains forced labour... Thus it gives rise to a stage, on the one hand, in which coercion and monopolisation of

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক পরিণত হয় এমন একটি শ্রেণীতে যে শ্রেণী কেবল ততক্ষণই বাঁচতে পারে যতক্ষণ শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ থাকে এবং শ্রমিকের কাজ পাওয়ার সুযোগ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ শ্রমশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধির সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকে। কাজেই পুঁজির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পুঁজির কলেবর বৃদ্ধি করা। আর এই স্বার্থেই ক্রমান্বয়ে উৎপাদন শক্তিকে বিকশিত করা এবং এই বিকশিত করতে গিয়ে ক্রমেই বেশি বেশি মানুষকে মজুরিভিত্তিক শ্রমিকে পরিণত করা পুঁজির অন্যতম ধর্ম হয়ে উঠে। বাজারের চাহিদা অনুসারে ক্রমাগত সমস্ত দুনিয়াকে গ্রাস করার প্রচেষ্টা পুঁজিবাদের একটি স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে পড়ে। এই নিয়মগুলোর মধ্যেই পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসের বীজ লুকায়িত থাকে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে বলেন, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূল শর্ত হলো পুঁজির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। পুঁজির শর্ত হলো মজুরি-শ্রম। মার্ক্স-এর মতে, "Thus, the cost of production of simple labour-power amounts to the cost of the existence and propagation of the worker. The price of this cost of existence and propagation constitutes wages."[১] অর্থাৎ, সাধারণ শ্রমশক্তির উৎপাদন ব্যয় হলো মজুরের জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচের সমান। এই জীবনধারণ ও বংশরক্ষার খরচের দাম হলো মজুরি। মজুরি-শ্রম সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোয়াশ্রেণী কোন রকম চিন্তাভাবনা না করেই শ্রম-শিল্প বা যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধি করে চলে। এই অগ্রগতির ফলে প্রতিযোগিতা-হেতু জোটবদ্ধ হওয়ার দরুন শ্রমিকদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতার

---

social development...by one portion of society at the expense of the other are eliminated; ... it creates the material means and embryonic conditions, making it possible in a higher form of society to combine this surplus-labour with a greater reduction of time devoted to material labour in general. Karl Marx, *Capital : A Critique of Political Economy,*(Vol-III), Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 37, International Publishers, New York, 1998, pp. 805-806.

[১] Karl Marx, *Wage Labour and Capital*, Karl Marx and Fredrick Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 159.

জায়গায় দেখা দেয় বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বা বস্তু ভোগদখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটিই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়াশ্রেণী সৃষ্টি করছে সর্বোপরি তারই নিজের কবর খনকদের। কাজেই বুর্জোয়াদের পতন এবং প্রলেতারিয়েতদের জয়লাভ — দুইই সমান অনিবার্য।[১]

১.৮ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ঃ প্রলেতারিয়েত মিশন

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো তত্ত্বগত দিক এবং অন্যটি হলো প্রয়োগগত দিক। তত্ত্বগত দিক অনুসারে ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব যুক্ত থাকে এবং শ্রেণী-সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথে চালিত হয়। এই একনায়কত্বই হলো সকল শ্রেণীর বিলোপ এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উত্তরণ যুগ সৃষ্টি করে। প্রয়োগগত দিক অনুসারে বিভিন্ন দেশে আর্থসামাজিক অবস্থা বিকাশের স্তর অনুযায়ী শ্রেণী সমাজ থেকে শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারিত হয়। মার্ক্স ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বগত দিক ও প্রয়োগগত দিক — উভয় দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত পথেই প্রয়োগের অগ্রগতি সম্ভব এবং প্রয়োগক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার দাবিতেই আবার তত্ত্বের সম্প্রসারণ, সংশোধন ও সমৃদ্ধি ঘটে।

মার্ক্স-এর ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাস বিজ্ঞানে বিপ্লব এনেছিল। কারণ তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি প্রত্যক্ষ গুরুত্ব ছিল। বিশেষ করে ফরাসি ও জার্মানদের মধ্যে কমিউনিজমকে, ইংরেজদের মধ্যে চার্টিস্টবাদকে

---

[1] The essential conditions for the existence and for the sway of the bourgeois class is the formation and augmentation of capital; the condition for capital is wage-labour. Wage-labour rests exclusively on competition between the labourers. The advance of industry, whose involuntary promoter is the bourgeoisie, replaces the isolation of the labourers, due to competition, by the revolutionary combination, due to association. The development of Modern Industry, therefore, cuts from under its feet the very foundation on which the bourgeoisie produces and appropriates products. মিলিয়ে দেখুন, K. Marx and F. Engels, *Manifesto of the Communist Party,* Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 119.

কোন আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হয়নি। মার্ক্স-এর মতে, বুর্জোয়াদের হাত থেকে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পুঁজি কেড়ে নেয়ার জন্য রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং উৎপাদন-শক্তির মোট পরিমাণকে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তোলার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে।[১] মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসবিজ্ঞানে বিশেষ করে তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে বিপ্লব এনেছিল। এই আন্দোলন হলো আধুনিক শোষিত শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন, শাসকশ্রেণী বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তার ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের কমবেশি বিকশিত বিভিন্ন রূপ, শ্রেণী-সংগ্রামেরে রূপ। কারণ সমগ্র সমাজকে শ্রেণী-বিভাজন থেকে এবং কার্যত শ্রেণী-সংগ্রাম থেকে মুক্ত না করে আজকের দিনের শোষিত শ্রেণী প্রলেতারিয়েত নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।[২]

প্রলেতারিয়েত মিশন হলো বর্তমানের বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের হাতে কর্মনীতি পরিচালনা করা এবং বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা, যার উদ্দেশ্য হলো সমাজতন্ত্র নির্মাণ ও কমিউনিজম নির্মাণের দিকে সমাজের রূপান্তর সাধন। বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করার জন্য, প্রতিক্রিয়াশীলদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জনগণের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এবং সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের জন্য প্রলেতারিয়েত মিশন প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত মিশনের লক্ষ্য হলো বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎখাত, শ্রেণী বিলোপ সাধন, মানুষের উপর মানুষের সর্ববিধ শোষণের অবসান এবং শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ।

---

[১] The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degrees, all capital from the bourgeoisie, to centralise all instruments of production in the hands of the State, *i.e.,* of the proletariat organised as the ruling class; and to increase the total of productive forces as rapidly as possible. মিলিয়ে দেখুন, Karl Marx and Fredrick Engels, *Manifesto of the Communist Party,* Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 6, *op. cit.,* p. 504.)

[২] This discovery, which revolutionised the science of history... These movements now presented themselves as a movement of the modern oppressed class, the proletariat, as the more or less developed forms of its historically necessary struggle against the ruling class, the bourgeoisie; as forms of the class struggle, ... cannot achieve its emancipation without at the same time emancipating society as a whole from division into classes and, therefore, from class struggles. Fredrick Engels, *On The Hisrory of Communist League,* Karl Marx and Fredric Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* pp. 178-179.

মার্ক্স মনে করেন, প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক যুগকে যথার্থভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করার জন্য ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভূমিকা রয়েছে। এজন্য তিনি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমকালীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। আসন্ন বিপ্লবের জন্য বৈজ্ঞানিক রণকৌশলে সজ্জিত করতে হলে নতুন কমিউনিস্ট লীগ ও সমগ্র শ্রমিক তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে সচেতন ও শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর চিন্তাধারার মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে। এই লক্ষ্যে ১৮৪৬ সালে মার্ক্স ও এঙ্গেলস জার্মান থেকে রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত ছোট প্রগতিশীল জার্মান রাজনৈতিক চরিত্র ও সম মনোভাবসম্পন্ন বন্ধুদের নিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে (Brussels) গঠন করেন কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি (Communist Corresponding Committee)। এই কমিটির ব্রাসেলস কেন্দ্রের প্রধান কর্ণধার ছিলেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস। এই কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন ভিলহেল্‌ম ভোল্‌ফ (Wilhelm Wolff), যিনি ভূমিদাসের সন্তান হয়েও শিক্ষকতা জড়িত থেকে সাইলেসিয়ার কৃষকশ্রেণীর (Silesian peasantry) পক্ষ সমর্থন করে বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রুশিয়া (Prussian) সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করেন। মার্ক্স-এর ধারণা ছিল সমস্ত দেশের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে একটি আন্তর্জাতিক প্রচারকেন্দ্র সংগঠিত করা যাবে। এই প্রচারকেন্দ্রই ধীরে ধীরে একটি কমিউনিস্ট কর্মসূচি সামনে রেখে বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ধারণা প্রয়োগের জন্য একটি প্রয়োজনীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভা (R. Stepanov) বলেন,

> শ্রমিক শ্রেণীর বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এমন এক প্রলেতারীয় পার্টি গঠন, যা হবে বিপ্লবী তত্ত্বের বাহক, প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের সংগঠক ও পরিচালক। মার্কস ও এঙ্গেলসের কল্পনায় তখন তাঁদের ভবিষ্যৎ পার্টি আন্তর্জাতিক সংগঠনে রূপে দেখা দেয়। এহেন পার্টির ভিত্তিস্থাপন এবং তার কর্মীদল গড়ে

তোলার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন।[১]

কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটির (Communist Corresponding Committee) ব্রাসেলস কেন্দ্রের সাথে খুব দ্রতই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৬ সালের শেষদিকে প্যারিস ও লন্ডনের League of the Just[2]-এর সদস্যদের অনেকের মধ্যেই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদ (true Socialism) ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটে। কারণ League of the Just-এর সদস্যরা দেখলেন যে, কাল্পনিক সমাজতন্ত্র, খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি মতবাদ দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। কাজেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের পথে অগ্রসর হয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর মতাদর্শ গ্রহণ করা উচিত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে League of the Just-এর লন্ডনের নেতৃবৃন্দ অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের কথা চিন্তা করেন। ১৮৪৭ সালের জুন মাসে লন্ডনে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস থেকেই League of the Just-এর সদস্যরা মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটির (Communist Corresponding Committee) সাথে একীভূত হওয়ার ফলে নতুন কর্মসূচি নিয়ে কমিউনিস্ট লীগ (Communist League) নামে নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন মার্ক্স ও এঙ্গেলস। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ইউটোপীয়, সংকীর্ণতাবাদ ও পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর সংগ্রাম এবং তাঁদের পরিচলিত ব্রাসেলস (Brussels) কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটির (Communist Corresponding Committee) কার্যকলাপ নিজস্ব ফল প্রদান করে এবং ১৮৪৭ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট লীগের (Communist League) ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং এই কমিউনিস্ট লীগের (Communist League) লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়, বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণী তথা

---

১ ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভা, *কার্ল মার্কস*, অনুবাদঃ অরুণ সোম, সম্পাদনাঃ সুবীর মজুমদার, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৩০।

২ League of the Just হলো ১৮৩৬ সালে প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কারণের দেশত্যাগী জার্মান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি সংগঠন। এই সংগঠনটি কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী ও খাঁটি সমাজতন্ত্রীদের (utopian socialist and Christian communist) প্রতি অনুরক্ত ছিল। League of the Just-এর প্রধান স্লোগান ছিল 'সকল মানুষ ভাই' ("All Men are Brothers") এবং প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্প্রীতি, সাম্য ও ন্যায়ের আদর্শের ভিত্তিতে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম করা ("the establishment of the Kingdom of God on Earth, based on the ideals of love of one's neighbor, equality and justice")।

প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণী বিরোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বিলোপ এবং শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।[১] League of the Just-এর 'সকল মানুষ ভাই' ("All Men are Brothers")-এর অমূর্ত মানবতাবাদী স্লোগানের পরিবর্তে শ্রমিক আন্দোলনের শ্রেণী চরিত্র ও আন্তর্জাতিক চরিত্রের অভিব্যক্তিসূচক নতুন বিপ্লবী স্লোগান —'দুনিয়ার মজুর এক হও!' (*Working Men of All Countries, Unite!*) গ্রহণ করা হলো। কমিউনিস্ট লীগ (Communist League) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠে। কমিউনিস্ট লীগের (Communist League) প্রথম প্রতিনিধি সম্মেলন (Congress)-এর পর মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর প্রায়োগিক বিপ্লবী কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ করে। জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ সম্প্রসারণের জন্য ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে এঙ্গেলস-এর সহযোগিতায় 'ব্রাসেলস জার্মান শ্রমিক সমিতি' স্থাপিত হয়। ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ব্রাসেলস জার্মান শ্রমিক সমিতি'তে কার্ল মার্কস রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের উপর অনেকগুলো বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলো একত্রিত করে ১৮৪৯ সালে '*Wage Labour and Capital*' (1847) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৮৪৯ সালে প্রকাশিত মার্ক্স-এর '*Wage Labour and Capital*' (1847) গ্রন্থে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। কারণ মার্ক্স-এর '*Wage Labour and Capital*' (1847) গ্রন্থটির মূল বিষয় হলো, পুঁজিপতি বা উৎপাদন উপায়ের মালিক এবং উৎপাদন উপায় থেকে বঞ্চিত মজুরি শ্রমিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। শ্রমিক মজুরি পায় আর পুঁজিপতি পায় মুনাফা। মার্ক্স-এর মতে, মজুরি ও মুনাফার অনুপাত একে অপরের বিপরীত। অর্থাৎ পুঁজির স্বার্থ আর মজুরি শ্রমিকের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এমনকি উৎপাদন-শক্তি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের মজুরি সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিপতিদের মুনাফা সেই তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এর ফলে শ্রমিক ও

[১] "The aim of the League is the overthrow of the bourgeoisie, the rule of the proletariat, the abolition of the old, bourgeois society based on class antagonisms and the foundation of a new society without classes and without private property" মিলিয়ে দেখুন, Fredrick Engels, *On The Hisrory of Communist League,* Karl Marx and Fredric Engels Selected Works, Volume Three, *op. cit.,* p. 182.

পুঁজিপতির মধ্যে সামাজিক ব্যবধান বাড়তে থাকে এবং একইসঙ্গে শ্রমের উপর পুঁজির শাসনক্ষমতাও জোরদার হয়। মার্ক্স-এর মতে, পুঁজি বাড়লে মজুরি শ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং মজুরি শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। মজুরির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনশীল পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। উৎপাদনশীল পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনদৌলত, বিলাসদ্রব্য, সামাজিক চাহিদা ও সামাজিক উপভোগও সমান গতিতেই বৃদ্ধি পায়। তবে মজুরের উপভোগ কিছুটা বাড়লেও তার থেকে সামাজিক উপভোগ যে পরিমাণ পাওয়া যায় (মজুরের কাছে যা দুর্লভ) তা পুঁজিপতিদের বর্ধিত উপভোগের তুলনায় এবং সমস্ত সমাজ বিকাশের তুলনায় পিছিয়ে থাকে। মার্ক্স বলেন,

> If capital grows, the mass of wage-labour grows, the number of wage-workers increases; in a word, the sway of capital extends over a greater mass of individuals. ... An appreciable rise in wages presupposes a rapid growth of productive capital. Rapid growth of productive capital calls forth just as rapid a growth of wealth, of luxury, of social needs and social pleasures. Therefore, although the pleasures of the labourer have increased, the social gratification which they afford has fallen in comparison with the increased pleasures of the capitalist, which are inaccessible to the worker, in comparison with the stage of development of society in general. Our wants and pleasures have their origin in society; we therefore measure them in relation to society; we do not measure them in relation to the objects which serve for their gratification. Since they are of a social nature, they are of a relative nature.[১]

'*Wage Labour and Capital*' (1847) গ্রন্থে মার্ক্স বুর্জোয়া সমাজের প্রধান দুটি শ্রেণীর মধ্যে আপসহীন ও বৈরিভাবাপন্ন বিরোধের অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য ও লেখালেখির পাশাপাশি এর প্রয়োগিক কার্যকলাপের প্রতি মার্ক্স-

[১] Karl Marx, *Wage Labour and Capital*, Karl Marx and Fredric Engels Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 163.

এর মনোযোগ প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভা (R. Stepanov) বলেন,

> তাত্ত্বিক গবেষণার পাশাপাশি ব্যবহারিক বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রতি মার্কসকে উত্তরোত্তর মনোযোগ দিতে হচ্ছিল। ইতিমধ্যে অনেকগুলি লক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছিল যে ইউরোপে বিপ্লবের ঝটিকা ঘনিয়ে আসছে। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানা বিলোপ, বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্তি, ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র গঠন—এমনই ছিল ইউরোপে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান কাজ।[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড প্রচারের লক্ষ্যে মার্ক্স ও এঙ্গেলস ১৮৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে প্রকাশিত *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* (জার্মান-ব্রাসেলস সংবাদপত্র)-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গ সংযোগ স্থাপন করেন। এ অবস্থায় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক কর্মকাণ্ড প্রচারের লক্ষ্যে ১৮৪৭ সালের শেষদিকে সরকারিভাবে না হলেও কার্যত *Deutsche-Brüsseler-Zeitung* (জার্মান-ব্রাসেলস সংবাদপত্র) প্রলেতারিয়েত পার্টি তথা কমিউনিস্ট লীগের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই সংবাদপত্রে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে মার্ক্স ও এঙ্গেলস প্রুশিয়ার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মত প্রচার করেন এবং প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কর্মকৌশলের সুস্পষ্ট চিত্র আঁকেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান ধারা বিশেষ করে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর ভূমিকা সম্পর্কে, সমাজের শ্রেণী-কাঠামো সম্পর্কে, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে, বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পর্কে মার্ক্স পাঠকসমাজকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভা (R. Stepanov) বলেন,

> আসন্ন বিপ্লবের চালিকাশক্তি বিশ্লেষণ করে মার্কস দূরদর্শিতার সাহায্যে নির্ণয় করেছেন জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর গভীর ব্যাধির আক্রমণ—তার ভীরুতা ও শক্তিহীনতা। তিনি দেখিয়েছেন এর ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল : জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে বিলম্বে; কেবল ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে নয়, এমনকি ইতিমধ্যে জার্মানিতে যখন

[১] ইয়েভগেনিয়া স্তেপানভা, *কার্ল মার্কস*, অনুবাদঃ অরুণ সোম, সম্পাদনাঃ সুবীর মজুমদার, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬, পৃ-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

> বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে সংগ্রাম বিস্তার লাভ করে গেছে, সেই পরিস্থিতিতে জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী তার প্রভুত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট। এই কারণে বুর্জোয়া শ্রেণী চেষ্টা করবে বিপ্লব ছাড়া, রাজকীয় শাসনব্যবস্থা ও অভিজাত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপসের পথে প্রুশিয়ার রাজতন্ত্রের বুর্জোয়া রাষ্ট্রে রূপান্তর ঘটাতে। স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে যে শক্তি চূড়ান্তভাবে দমন করার মতো ক্ষমতা রাখে তা মার্কস দেখতে পেয়েছেন জনগণের মধ্যে—প্রলেতারিয়েত, ক্ষুদ্র কৃষক আর শহরের পেটি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে।[১]

এভাবেই জার্মানি ও ইউরোপের আরো কিছু দেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক কর্ম হিসেবে আসন্ন বিপ্লবের প্রধান কর্তব্য ও চালিকাশক্তি শক্তি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিপ্লবের ধারণা স্থান পেতে শুরু করে। ফলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক কর্ম হিসেবে আসন্ন সংগ্রামের জন্য কমিউনিস্ট লীগের সদস্যদের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতিকে মার্ক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করেন। এরই প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন (Congress) অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট লীগের দ্বিতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন (Congress) অনুষ্ঠিত হয় এবং এই দ্বিতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন (Congress) থেকে কমিউনিস্ট ইস্তেহার রচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৪৭-১৮৪৮ সালে মার্ক্স ও এঙ্গেলস রচিত '*কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার*' ('*Manifesto of the Communist Party*') নামক পুস্তিকাটি মূলত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক কর্ম পরিকল্পনার দিক নির্দেশনামূলক পুস্তিকা। কারণ এই পুস্তিকাটির প্রকাশকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে, পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রলেতারীয় আন্দোলনের পথ নির্দশকের ভূমিকা পালন করছে। এ প্রসঙ্গে '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) নামক সাড়া জাগানো পুস্তিকার ১৮৮৮ সালের ইংরেজি সংস্করণ ও ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের মূলনীতি ও বিপ্লবের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার' ('*Manifesto of the Communist Party*') নামক পুস্তিকাটিতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বগত পূর্বশর্তের ভিত্তিতে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩.

শ্রেণীভিত্তিক ও বৈরিভাবাপন্ন সমাজের পরিস্থিতিতে বিকাশের চালিকাশক্তি রূপে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে সূত্রবদ্ধ করেন। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার' ('*Manifesto of the Communist Party*')-এ প্রথমেই বলা হয়েছে যে,

> আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান এবং প্লিবিয়ান, জমিদার ও ভূমিদাস, গিল্ডকর্তা ও কারিগর, এককথায় অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, কখনো প্রকাশে কখনো বা গোপনে অবিরাম লড়াই চালিয়েছে। প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলোর সকলের ধ্বংসের মধ্যে।[১]

বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম অবশ্যই বিপ্লবের আকার ধারণ করবে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রলেতারিয়েরা বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবে। কারণ প্রলেতারিয়েতই হলো ইতিহাসে একমাত্র শ্রেণী যারা নিজেকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব সমাজকেও সকল ধরনের শোষণ থেকে মুক্ত করে। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার' ('*Manifesto of the Communist Party*')-এ বলেন,

> শ্রমশিল্পের অগ্রগতি বুর্জোয়াশ্রেণী না ভেবেচিন্তেই বাড়িয়ে চলে। এই অগ্রগতির ফলে প্রতিযোগিতা-হেতু শ্রমিকদের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতার জায়গায় দেখা দেয় সমিতিতে জোটবদ্ধ হওয়ার দরুন তাদের বিপ্লবী সংহতি। সুতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য ভোগদখল করে আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশ সেই ভিত্তিটিই পায়ের তলা থেকে কেটে ফেলে দিচ্ছে। তাই বুর্জোয়াশ্রেণী

---

[১] The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes. (মিলিয়ে দেখুন, Karl Marx and Fredrick Engels, *Manifesto of the Communist Party,* Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 6, *op. cit.,* pp. 482.)

> সর্বোপরি সৃষ্টি করছে তার নিজের কবর-খনকদের। বুর্জোয়াদের পতন ও প্রলেতারিয়েতদের জয়লাভ—দুই সমান অনিবার্য।[১]

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব সম্পর্কে মার্ক্স তাঁর নিজের মতামতের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, উৎপাদন বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল এবং শ্রেণী-সংগ্রাম আবশ্যিকভাবে প্রলেতারিয়েতকে একনায়কত্বের দিকে নিয়ে যায়। এই প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সমস্ত শ্রেণী ধারণার বিলোপ সাধন করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে থাকে। মার্ক্স ১৮৫২ সালে ৫ মার্চ জে. ভেইদমেয়ারের (J. Weydemeyer) কাছে লিখিত চিঠিতে এ প্রসঙ্গে বলেন,

> My own contribution was 1. to show that the *existence of classes* is merely bound up with certain *historical phases in the development of production*; 2. that the class struggle necessarily leads to the *dictatorship of the proletariat*; 3. that this dictatorship itself constitutes no more than a transition to the *abolition of all classes* and to a *classless society*.[২]

'*কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার*' ('*Manifesto of the Communist Party*')-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'প্রলেতারিয়েত এবং কমিউনিস্টদেরা' (Proletarians and Communists)-এর বিষয়বস্তু হলো প্রলেতারীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা, তার ভূমিকা, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কীয় আলোচনা। মার্ক্স ও এঙ্গেলস এখানে প্রলেতারীয় পার্টি সম্পর্কে মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। '*কমিউনিস্ট পাটির ইস্তেহার*' ('*Manifesto of the Communist Party*')-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কমিউনিস্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

---

[১] The advance of industry, whose involuntary promoter is the bourgeoisie, replaces the isolation of the labourers, due to competition, by the revolutionary combination, due to association. The development of Modern Industry, therefore, cuts from under its feet the very foundation on which the bourgeoisie produces and appropriates products. What the bourgeoisie therefore produces, above all, are its own grave-diggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable. (মিলিয়ে দেখুন, *Ibid,* p. 496.

[২] Karl Marx, *Letter* (Marx to Joseph. Weydemeyer in New York, March 5, 1852), Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 39, *op. cit.,* pp. 62-65.

Dhaka University Institutional Repository

> কমিউনিস্টরা হলো একদিকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বাপক্ষো অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ — যে অংশ অন্যান্য সকলকে সামনে নিয়ে যায়। তাত্ত্বিক দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েতের অধিকাংশের তুলনায় তাদের সুবিধা এই যে, শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত ও শেষ সাধারণ ফলাফল সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ বোধ রয়েছে। কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য হলো- প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী হিসেবে গঠিত করা, বুর্জোয়া আধিপত্য বিস্তার করা, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করা।[১]

'*কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার*' ('*Manifesto of the Communist Party*')-এর উপসংহার ঘটেছে প্রলেতারীয় বিপ্লবের খোলাখুলি ও দৃপ্ত আহ্বান দিয়ে—"দুনিয়ার মজুর এক হও!" (Working Men of All Countries, Unite!)। এই স্লোগানের মাধ্যমে কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসকশ্রেণীরা আজও ভীতসন্ত্রস্ত। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছুই নেই, বরং জয় করার জন্য রয়েছে সারা দুনিয়া। তাইতো বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিজ্ঞান হিসেবে '*কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার*' ('*Manifesto of the Communist Party*')-এ প্রচারিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের শব্দধ্বনিতে অভিনন্দিত হয়েছিল।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় লাভ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, পুঁজিবাদী সমাজের জীবন যতই দীর্ঘ হতে থাকবে শোষণের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার চাপ ততই বাড়বে এবং শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এই জাতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম কেবল পুঁজিবাদী যুগের বৈশিষ্ট্য নয়। এই জাতীয় শ্রেণী-সংগ্রাম প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের পর্যায় পরিবর্তনকালে সমসাময়িক শাসকশ্রেণী ও

---

[১] The Communists, therefore, are on the one hand, practically, the most advanced and resolute section of the working-class parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement. The immediate aim of the Communists is the same as that of all other proletarian parties: formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat. (মিলিয়ে দেখুন, K. Marx and F. Engels, *Manifesto of the Communist Party,* Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 120.)

শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ঘটে থাকে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রতিটি যুগে সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পুঁজিবাদী যুগে এই সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব দেয় কমিউনিস্টরা। এই সূত্রে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অর্থনীতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান, প্রচলিত নৈতিক অনুশাসন ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটবে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেন, বিপ্লবের পথেই শ্রমিকশ্রেণী বিজয় লাভ করবে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হলো প্রলেতারিয়েতদেরকে শাসকশ্রেণীর পদে উন্নীত করা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা। এর পরের পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বুর্জোয়াদের হাত থেকে সমস্ত পুঁজি ক্রমে ক্রমে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য, রাষ্ট্র অর্থাৎ শাসকশ্রেণী হিসেবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ কেন্দ্রীভূত করার জন্য এবং যত দ্রুত গতিতে সম্ভব সমস্ত উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে কাজে লাগাবে।[১]

এই আধিপত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে দশদফা পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছেন।[২] এই দশদফা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিণতিতে যে সমাজ ব্যবস্থা জন্ম লাভ করবে সেই সমাজ ব্যবস্থার একটি রূপরেখা মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়ে যাবে এবং সমস্ত উৎপাদন যখন গোটা জাতির এক বিশাল সমিতির (association) হাতে কেন্দ্রীভূত হবে তখন জনশক্তির (public power) রাজনৈতিক চরিত্র আর থাকবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো এক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য শ্রেণীর সংগঠিত ক্ষমতা মাত্র। বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সময় অবস্থার চাপে যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে একটি শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, যদি প্রলেতারিয়েত নিজেকে বিপ্লবের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীতে পরিণত করে এবং তার ফলে যদি উৎপাদনের পুরনো ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে তবে সেই পুরনো ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বিরোধ তথা সবরকম শ্রেণীর অস্তিত্বটিই দূর করবে এবং তাতে করে শ্রেণী হিসেবে

---

[১] The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degree, all capital from the bourgeoisie, to centralise all instruments of production in the hands of the State, *i.e.*, of the proletariat organised as the ruling class; and to increase the total productive forces as rapidly as possible. মিলিয়ে দেখুন, *Ibid,* p. 126

[২] মিলিয়ে দেখুন, *Loc. cit.,*

তাদের স্বীয় আধিপত্যেরও অবসান ঘটবে। শ্রেণী ও শ্রেণী-বিরোধ সংবলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে একটি সমিতি (association), যার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত।[১]

মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর মতে, সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অবশ্যম্ভাবী কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সচেতন প্রয়াস। বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য যেমন শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামীদেরকে সামনের সারিতে প্রয়োজন তেমনি বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে অন্য কোন পথ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতা পুনঃদখল করতে না পারে তার জন্য সতর্কতা ও প্রস্তুতিরও প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য সবকিছুর আগে প্রয়োজন শ্রমকশ্রেণী বা প্রলেতারীয়কে একটি বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত করা এবং এই বিপ্লবী শ্রেণীকে তার রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা। শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া এই রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করা সম্ভব নয় বলে মার্ক্স ও এঙ্গেলস মনে করেন। আর শ্রেণী-সংগ্রামের ক্রমাগত তীব্রতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে আসে, পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস করে নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং নবগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বমূলক শাসনের মাধ্যমে শ্রেণী শোষণের মূল উচ্ছেদ করতে হয়। সকল ধরনের শ্রেণী শোষণ যেদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে সেদিন রাষ্ট্রশক্তিরও প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। আর এ কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবে কমিউনিস্টরা এবং তাদের সংগঠন। এ প্রসঙ্গে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের '*Manifesto of the Communist Party*' (1847-1848) গ্রন্থে বলেন, বাস্তবিকপক্ষে একদিকে কমিউনিস্টরা হলো প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলোর সবচেয়ে অগ্রসর ও দৃঢ়চিত্ত অংশ, যে অংশ অন্যান্য সবাইকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। অন্যদিকে, তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রলেতারিয়েতের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের তুলনায় তাদের এই সুবিধা

---

[১] Political power, properly so called, is merely the organised power of one class for oppressing another. If the proletariat during its contest with the bourgeoisie is compelled, by the force of circumstances, to organise itself as a class, if, by means of a revolution, it makes itself the ruling class, and, as such, sweeps away by force the old conditions of production, then it will, along with these conditions, have swept away the conditions for the existence of class antagonisms and of classes generally, and will thereby have abolished its own supremacy as a class. In place of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association, in which the free development of each is the condition for the free development of all. মিলিয়ে দেখুন, K. Marx and F. Engels, *Loc. cit.,*

রয়েছে যে, প্রলেতারিয়ান আন্দোলনের অগ্রগতির ধারা, তার শর্ত, তার চূড়ান্ত সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।[১]

ব্যাপক শ্রমিকশ্রেণীর অস্থিরতা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে দেশে দেশে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তিভূমি কাঁপিয়ে দিল এবং কোথাও কোথাও রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটলো। শ্রমিকশ্রেণী সরাসরিভাবে সাফল্য লাভ করতে না পারলেও তীব্রতর অত্যাচার, সীমাহীন আত্মত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের মধ্য দিয়ে তাদের চেতনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হলো অমূল্য সম্পদ, যা ভবিষ্যতের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়ে উঠে। 'কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার' ('*Manifesto of the Communist Party*') ছাপাখানা থেকে বের হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে প্যারিসে বিপ্লব শুরু হয়েছিল। ১৮৪৮ সালের ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফরাসির শ্রমিকশ্রেণী 'ব্যাঙ্ক মালিকদের রাজা' লুই ফিলিপকে পরাভূত করে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। কারণ কমিউনিস্ট লীগ, জার্মান শ্রমিক সমাজ (German Workers Society) এবং ব্রাসেলস ডেমোক্র্যাটিক এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে মার্ক্স প্রজাতন্ত্রের দাবিকে আন্দোলনে যুক্ত করেন। ১৮৪৮ সালের ১৩ মার্চ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এবং ১৮ মার্চ প্রুশিয়ার রাজধানী বার্লিনে অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং জনগণের বিজয় হয়। এই বিজয়ের ফলে জার্মানির অন্যান্য ছোট রাষ্ট্রগুলোতেও বিপ্লবী সংগ্রামের বিস্তার সম্ভব হয়।

১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত এই বিপ্লবগুলোর মূলে ছিল বিকাশমান পুঁজিবাদ ও কায়েমী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। ফরাসিতে যদি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের বিপ্লবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তবু আরেকটি বিপ্লব অনিবার্য হয়ে

---

[১] The Communists are distinguished from the other working-class parties by this only: 1. In the national struggles of the proletarians of the different countries, they point out and bring to the front the common interests of the entire proletariat, independently of all nationality. 2. In the various stages of development which the struggle of the working class against the bourgeoisie has to pass through, they always and everywhere represent the interests of the movement as a whole. মিলিয়ে দেখুন, K. Marx and F. Engels, *Manifesto of the Communist Party,* Karl Marx and Fredrick Engels, Selected Works, Volume One, *op. cit.,* p. 120.

উঠেছিল। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভূ-স্বামীদের আধিপত্যের অবসান করা।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক নীতি হিসিবে বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্য অর্জিত হতে থাকে। কিন্তু যতদিন না বিভিন্ন অংশে প্রভূত্বকারী রাজাদের উৎখাত করা যাচ্ছে, বৃহৎ জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে, বিভিন্ন প্রান্তে বিভাজন রদ করা যাচ্ছে এবং অবিভক্ত জার্মান প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রামের কোন বিশ্রাম নেই। এই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে মার্ক্স ও এঙ্গেলস অবিভক্ত জার্মান প্রজাতন্ত্রের মূল দাবীর ভিত্তিতে ১৭ দফা দাবী সম্বলিত 'জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দাবীসমূহ' (Demands of the Communist Party in Germany) রচনা করলেন এবং এই দাবীগুলো ১৮৪৮ সালে লিফলেট আকারে জনগণের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন। প্রথমে প্যারিসে এই দাবীসমূহ[১] প্রকাশিত হয় এবং অব্যবহিত পরেই জার্মানির বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তা মুদ্রিত হয়।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস জার্মানির বিপ্লবের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে *'জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দাবিসমূহ' (Demands of the Communist Party in Germany)*-এর মূল দাবিতে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জার্মানি ঘোষিত হচ্ছে অখণ্ড, অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্ররূপে।[২] একমাত্র অখণ্ড প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভগ্নদশার, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার ঐক্যের বিশ্বসূচক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এবং ক্ষুদ্রতর

---

[১] ১৭ দফা দাবীগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Karl Marx and Fredrick Engels, *Demands of the Communist Party in Germany,* Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 7, Progress Publishers, Mascow, 1980. pp. 3-7.

[২] 1.The whole of Germany shall be declared a single and indivisible republic. ... 3. Representatives of the people shall receive payment so that workers, too, shall be able to become members of the German parliament. 4. Universal arming of the people. In future the armies shall be simultaneously labour armies, so that the troops shall not, as formerly, merely consume, but shall produce more than is necessary for their upkeep. This will moreover be conducive to the organisation of labour. বিস্তারিত দেখুন, *Ibid,* p. 3.

রাষ্ট্রসমূহের অসংখ্য রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো সম্ভব। এর ফলে জার্মানি জাতি গঠন সম্পন্ন হতো, জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত গড়ে উঠতে পারতো।

'জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দাবিসমূহ' (Demands of the Communist Party in Germany)-এর ১৭ দফা দাবিপত্রের মাধ্যমে অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণীগুলোর সমস্যাসমূহ প্রতিফলিত হয়। দাবিপত্রের শেষে বলা হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণী, পেটিবুর্জোয়া ও কৃষকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই এই দাবিগুলোকে কার্যকর করার জন্য সমস্ত উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসবে। আর এই দাবিসমূহ কার্যকর হলে অল্প কয়েকজন শাসকের দ্বারা শোষিত লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা নির্যাতিত অথচ সকল সম্পদের স্রষ্টা হিসেবে সমস্ত শক্তির মালিক তারাই অধিকার ও শক্তি অর্জন করবে।[১]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রথম প্রয়োগ ঘটে ১৮৭১ সালে। কারণ পরাজিত ফরাসির বৃহৎ বুর্জোয়া সরকার যখন শান্তির শর্ত পূরণে হিমশিম খাচ্ছে তখন ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ বিশ্ববাসী দেখলো প্যারিসের সিটি হলের মাথায় লাল পতাকার ঝান্ডা উড়ছে। আর এই পতাকা তুলেছিল প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী। প্যারিসের বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রাজধানীর প্রশাসনের দায়িত্ব পড়ে। ১৮৭১ সালের ২৬ মার্চ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হলো কমিউনের শাসন পরিষদ। প্যারিসের সিটি হলের চত্বরে হাজার হাজার কণ্ঠের 'কমিউন জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যে মানব ইতিহাসে প্রথম শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলো। ক্ষমতা দখলের কয়েকদিনের মধ্যেই কমিউন সরকারি বাহিনীকে নিরস্ত্র করে জনগণকে অস্ত্রে সজ্জিত করলেন, বিচারক ও আমলাতন্ত্রকে বিদায় দিয়ে সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় বসালেন, মালিকদের পরিত্যক্ত ও বন্ধ কলকারখানা শ্রমিক সমবায় গঠন করে চালু করলেন, কর লোপ করে ডিক্রি জারি করলেন, নারীদের সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দিয়ে আইন তৈরি করলেন। কিন্তু এই কমিউন মাত্র ৭২ দিন (১৮৭১ সালের ৩০ মে কমিউনের পতন ঘটে) অস্তিত্ব

[১] It is to the interest of the German proletariat, the petty bourgeoisie and the small peasants to support these demands with all possible energy. Only by the realisation of these demands will the millions in Germany, who have hitherto been exploited by a handful of persons and whom the exploiters would like to keep in further subjection, win the rights and attain to that power to which they are entitled as the producers of all wealth. মিলিয়ে দেখুন, *Ibid,* p. 4-7.

রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বভাবতই এই অল্প সময়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যবস্থাগুলোর সূত্রপাত করা সম্ভব হয়নি। তবে মার্ক্স শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ও ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি নমুনা হিসেবে কমিউনকে অভিহিত করেন।

মার্ক্স তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্রগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি গঠনকে প্রধান করণীয় বলে গ্রহণ করেন। উনিশ শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জার্মান ও অস্ট্রিয়া অধিকৃত হাঙ্গেরিতে দুটি শ্রমিক পার্টির অস্তিত্ব ছিল। ১৮৭৭ সালে পুর্তগালে সোশালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮৭৮ সালে চেকোস্ণ্ঢাভ সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে মার্সাই শ্রমিক কংগ্রেস থেকে ফরাসি শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। ১৮৭৯ সালে আরো গঠিত হলো বেলজিয়ামের সোশালিস্ট পার্টি, হল্যান্ডের সোশালিস্ট পার্টি, স্পেনের সোশালিস্ট ওয়াকার্স পার্টি। ১৮৮১ সালে নেদারল্যান্ডে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন নামে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গঠিত হলো। ১৮৮২ সালে সুইডেনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৮৮২ সালে পোলিস সোশালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈপ্লবিক ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম সত্যে পরিণত হয় অর্থাৎ প্রায়োগিক সাফল্য অর্জন করে ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের সোভিয়েত রাশিয়ায় মহান লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে। শ্রমিকশ্রেণী যে ক্ষমতা দখল করতে পারে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে এই বিশ্বাস বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অর্জিত হলো। কারণ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে রুশ বিপ্লব শৃঙ্খলিত জনগণের মধ্যে নিয়ে আসে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রথম সাফল্য। রুশ বিপ্লবের সফলতা ও তাদের অভ্যন্তরীণ শত্রুদের পরাভূত করার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে প্রথম শ্রমিক বা প্রলেতারীয় রাষ্ট্র হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। রুশ বিপ্লবের সফলতার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি প্রায়োগিক দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাস

মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি জীবনমুখী দর্শন। গত একশ বছরে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ পৃথিবীতে যতখানি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে অন্য কোন মতবাদ ততটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের লক্ষ্যে মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ইউরোপ, আমেরিকা ও তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সাফল্যের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক বিপ্লবের প্রভাব আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন লেনিন। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ তথা কমিউনিজম মতবাদ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' গড়ে তোলেন। ফলে চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমজাদ হোসেন উল্লেখ করেন,

> উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলিত জনগণের মধ্যে রুশ বিপ্লব নিয়ে আসে দেদীপ্যমান আলোকচ্ছটা। 'অক্টোবর বিপ্লবের[১] তোপধ্বনি' চীনে মার্কসবাদ নিয়ে এলো, লিখেছেন মাও সেতুং। ১৯২১ সালে জন্ম হলো চীনা কমিউনিস্ট পার্টির। ১৯১৭ সালে মে মাসে লেনিনের প্রচেষ্টায় সুইডেনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠে। অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, গ্রীস, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠলো ১৯১৮ সনে। ১৯১৯ সনে পার্টি গঠিত হলো যুগোশ্লাভিয়া, নেদারণ্যান্ডস, মেক্সিকো, জার্মানী (৩০ ডিসেম্বর-১ জানুয়ারি ১৯১৯), বুলগেরিয়া ও কোরিয়ায়। বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়াম, ডেনমার্কে ১৯২০ সনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়। ১৯২১ সনে কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম নেয় ইতালি, পর্তুগাল, সুইজারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও মঙ্গোলিয়ায়। এশিয়ার প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (পিকেআই) জন্ম হয় ১৯২০ সনের ২৩ মে। ফিলিপাইনস ও ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলো ১৯৩০ সনে। মালয়ে কমিউনিস্ট পার্টির গড়ে উঠে ১৯৩১ সনের জুলাইয়ে। ১৯৩৯ সনে বার্মায় গড়ে উঠলো কমিউনিস্ট পার্টি।[২]

---

[১] অক্টোবর বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লব হলো ১৯১৭ সালে সংঘটিত পৃথিবীর ইতিহাস তথা মানব ইতিহাসের এক রাজনৈতিক বিপ্লব। এই বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা বলা হয়। ১৯১৭ সালের ২৫ অক্টোবর এই বিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি ছিল শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, যার নেতৃত্বে ছিল লেনিন, ট্রটস্কি প্রমুখ। ১৯১৬ সালের পরবর্তী সময়ে রাশিয়া জার শাসনের ফলে এক ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করতে থাকে। উৎপাদন হ্রাস পায় ৫০ ভাগ শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশাল শ্রমিক শ্রেণীর জীবিকা বন্ধ হয়ে যায়। এ অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে খনি, ধাতু ও রেল শ্রমিকরা অবরোধ গড়ে তোলে। এই অবরোধে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক অংশ নিয়ে বিভিন্ন জায়গার শিল্পকারখানা নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং দাবানলের মতো বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে। বলশেভিক পার্টির জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে জার শাসনের অবসান হয় এবং শ্রমিকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

[২] আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১২।

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর বিপ্লবের তপোধ্বনির মাধ্যমে যেমন চীনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ও প্রসার হয়েছিল তেমনি তার প্রভাব ভারতবর্ষেও পৌঁছায়। অর্থাৎ, রুশ বিপ্লবের সাফল্য থেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে লেনিনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে মার্ক্সবাদ তথা কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ আসে। এ প্রসঙ্গে আমজাদ হোসেন বলেন,

> ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, বড় বড় জমিদার-জোতদার-মহাজনদের শোষণ, ভারতীয় সমাজের ক্রমবর্ধমান ভাঙন ও দৈন্যদশা, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন শোষক শ্রেণীর শোষণ ও নির্যাতন, শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও তার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ইত্যাদি মার্কসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছিল। ভারতের মার্কসবাদী বিপ্লবীরা দেশে ও বিদেশে থেকে মার্কসবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করেছেন।[১]

এরই ফলশ্রুতিতে রুশ বলশেভিক পার্টি[২] বিশেষ করে কমরেড লেনিন ও স্তালিনের পরামর্শক্রমে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর মানবেন্দ্র রায় (প্রকৃত নাম নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য) তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ করেন। এ প্রসঙ্গে জয়নাল আবেদীন উল্লেখ করেন,

> ...লেনিন যেমন ১৮৮০র দশকে লন্ডনে রুশ সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবেন্দ্র নাথ রায় ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর রাশিয়ার উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে সাত সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। কমিটির সদস্যরা ছিলেন: (১) মানবেন্দ্র নাথ রায় (এমএন রায়) (২) এভেলিন ট্রেন্ট রায় (৩) অবনী মুখার্জি (৪) রোজা ফিটিংগাফ (৫) মুহাম্মদ আলী (আহমদ হাসান) (৬) মুহাম্মদ সফিক সিদ্দিকী (৭) এম প্রতিবাদী বায়াক্কর আচার্য্য।

---

১ *Loc. cit.*

২ বলশেভিক (Bolsheviks) হলো মার্ক্সবাদী রাশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রিটিক লেবার পার্টির একটি উপদল, যা ১৯০৩ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এর অন্য একটি উপদল মেনশেভিক থেকে পৃথক হয়ে যায়। একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ফলে তাদের নাম হয় বলশেভিক (Bolsheviks)।

প্রার্থী সভ্যপদ থাকার মেয়াদ ৩ মাস। সদস্য সচিব নির্বাচিত হলেন মুহাম্মদ সফিক।[১]

সফিক।[১]

এরপর বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগকে আরো গতিশীল করার জন্য এখনো তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা হলো–

কর্মসূচি	**স্থান**	**তারিখ**	**নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক**
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন	তাসখন্দ, সোভিয়েত ইউনিয়ন	১৭ অক্টোবর, ১৯২০	মুহম্মদ সফিক সিদ্দিকী
কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইশতেহার বিলি	ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশন	১ লা ডিসেম্বর, ১৯২১	×
জাতীয় মুক্তির জন্য কর্মসূচি পেশ	ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশন	ডিসেম্বর, ১৯২২	×
প্রথম সর্বভারতীয় পার্টি সম্মেলন	কানপুর	২৬-২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯২৫	জানকীপ্রসাদে বাগেরহাট্টা ও এস ভি ঘাটে যুগ্ম-সম্পাদক
সর্বভারতীয় গোপন প্রতিনিধি বৈঠক	কলকাতা	ডিসেম্বর, ১৯৩৩	ড. গঙ্গাধর অধিকারী
প্রথম (প্রকাশ্য) পার্টি কংগ্রেস	বোম্বাই	২৩ শে মে – ১ লা জুন, ১৯৪৩	পি সি যোশী
দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস	কলকাতা	২৮ শে ফেব্রুয়ারি – ৬ই মার্চ, ১৯৪৮	বি টি রণদিভে
বিশেষ সম্মেলন থেকে পার্টি কর্মসূচি গ্রহণ	কলকাতা	৯ – ১৫ অক্টোবর, ১৯৫১	অজয়কুমার ঘোষ
তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস	মাদুরাই	২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ থেকে ৩রা জানুয়ারি, ১৯৫৪	ঐ
চতুর্থ পার্টি কংগ্রেস	পালঘাট	১৯ – ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৫৬	ঐ
পঞ্চম পার্টি কংগ্রেস	অমৃতসর	৬ – ১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৮	ঐ
ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেস	বিজয়ওয়াদা	৬ – ১৩ই এপ্রিল, ১৯৬১	ঐ
বিশেষ সর্বভারতীয় কনভেনশন	তেনালী	৭ – ১১ই জুলাই, ১৯৬৪	×

[১] জয়নাল আবদীন, *উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী ও বামধারার রাজনীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, বাংলা প্রকাশ, ঢাকা,২০১৩, পৃষ্ঠা-২২।

সপ্তম পার্টি কংগ্রেস এবং সি পি আই (এম) গঠন	কলকাতা	৩১ শে অক্টোবর – ৭ই নভেম্বর, ১৯৬৪	পি সুন্দরাইয়া
আদর্শগত প্লেনাম	বর্ধমান	৫ – ১২ এপ্রিল, ১৯৬৮	×
অষ্টম পার্টি কংগ্রেস	কোচিন	২৩ – ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮	পি সুন্দরাইয়া
নবম পার্টি কংগ্রেস	মাদুরাই	২৭ শে জুন – ২রা জুলাই, ১৯৭২	ঐ
দশম পার্টি কংগ্রেস	জলন্ধর	২ – ৮ই এপ্রিল, ১৯৭৮	ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ
সাংগঠনিক প্লেনাম	সালকিয়া	২৭ – ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮	×
একাদশ পার্টি কংগ্রেস	বিজয়ওয়ালা	২৬ – ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৮২	ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ
দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস	কলকাতা	২৫–৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫	ঐ
ত্রয়োদশ পার্টি কংগ্রেস	ত্রিবান্দ্রম	২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮৮ – ১ লা জানুয়ারি, ১৯৮৯	ঐ
চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেস	মাদ্রাজ	৩–৯ জানুয়ারি, ১৯৯২	হরকিষাণ সিং সুরজিৎ
পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস	চন্ডীগড়	৩–৮ই এপ্রিল, ১৯৯৫	ঐ
ষোড়শ পার্টি কংগ্রেস	কলকাতা	৫–১১ই অক্টোবর, ২০০০	ঐ
বিশেষ সম্মেলন	তিরুবনন্তপুরম	২০–২৩ শে অক্টোবর, ২০০০	পার্টি কর্মসূচিকে সময়োপযোগী করা হয়
সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেস	হায়দরাবাদ	১৯–২৪ শে মার্চ, ২০০২	হরকিষাণ সিং সুরজিৎ
অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেস	নয়াদিল্লি	৬–১১ই এপ্রিল, ২০০৫	প্রকাশ করাত

(**তথ্যসূত্র :** *ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) রাজনৈতিক প্রস্তাব সপ্তম–অষ্টাদশ কংগ্রেস;* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা–৬৪০–৬৫০ ।)

একথা নিশ্চিত যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় উপমহাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম লাভ করে। এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মুজফ্ফর আহ্মদ, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মানন্দ্রেনাথ রায়, সিম্পারাভেলু প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক ও কৃষকদের সংগ্রাম গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্ত হওয়ার পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রে কার্যক্রম পরিচলনা করার জন্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠে। এই

সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন নেতা এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক ও সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি ও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন পশ্চিম বাংলার শিলিগুড়ি এলাকার বিখ্যাত কৃষক নেতা চারু মজুমদার। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গরিব কৃষকদেরকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং ব্যাপক গণসংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের সামন্তবাদী জমিদার, জোতদার, মহাজনদের উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য সর্বাত্মক লড়াই করা। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতের কৃষক নেতরা ও পার্টির নেতারা একমত হতে পারেননি। তারপরেও চারু মজুমদার কৃষক আন্দোলনের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বার বার পার্টির নেতাদের কাছে তুলে ধরেন এবং লিখিতভাবে দলিলও উপস্থিত করেন। চতুর্থ দলিলে তিনি লিখেছেন,

> সমগ্র কৃষক শ্রেণী বর্তমান বিপ্লবের স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র এবং এই কৃষকশ্রেণী ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সববৃহৎ শক্তি এবং এই কথা মনে রেখেই আমাদের কৃষকশ্রেণীর আন্দোলনে এগোতে হবে। ... কৃষকের মধ্যে ধনী, মধ্য, দরিদ্র ও ভূমিহীন প্রধানত এই চারটি শ্রেণী আছে এবং আছে গ্রামের কারিগর শ্রেণী। অবস্থানুযায়ী তাদের বিপ্লবী চেতনা ও কর্মশক্তির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তাই মার্কসবাদীদের সর্বদাই চেষ্টা করতে হবে সমগ্র কৃষক আন্দোলনের ওপর দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।[১]

এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি সার্থক প্রয়োগ ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত হয়। ফলে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দলীয় নেতৃত্বে সংগঠিত হয় তেভাগা আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, কেরালায় পুন্নাপা ভায়াল আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন[২] ও কায়ুর

---

[১] আমজাদ হোসেন, *op.cit.,* পৃ. ১৩৬।

[২] তেভাগা আন্দোলন হলো কৃষি উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশের দাবিতে সংগঠিত বর্গাচাষিদের আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যশোর (নড়াইল), ময়মনসিংহ, খুলনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ[১] এবং নকশালবাড়ী কৃষক বিদ্রোহের[২] (১৯৬৭) ঘটনা খুবই গুরুত্বপর্ণ। নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রভাব সামগ্রিকভাবে যেভাবে পশ্চিমবাংলার যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছিল তেমনভাবে পূর্ববাংলার যুবসমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ, পূর্ববাংলার (বাংলাদেশ) ন্যাপ নেতারা, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট নেতারা, কৃষক নেতারা এবং মস্কোপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলো বিপ্লবের সময় এখনো হয়নি বলে নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি পর পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত কাউন্সিলররা ৬ মার্চ সাজ্জাদ জহিরকে সাধারণ সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। একই দিনে পূর্ববঙ্গের কাউন্সিলরগণ ২৯ সদস্যের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন খোকা রায়। কিন্তু পাকিস্তানে

জেলাসহ প্রায় ১৯টি জেলায় এই কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালে ভূমিমালিক ও ভাগচাষিদের মধ্যে উৎপাদিত ফসল সমান দুই ভাগ করার পদ্ধতির বিরুদ্ধে বর্গাদাররা প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।

১ তেলেঙ্গানা হলো দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্য। তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট সমর্থিত একটি কৃষক বিদ্রোহ। নালগোন্ডা লোর জমিদার রেড্ডি ও ভেলম জাতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। কৃষক ও ক্ষেতমজুররা জায়গিরদার ও দেশমুখ উপাধিধারী সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে এবং পরে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের নিজাম ওসমান আলি খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ হিংসাত্মক আকার ধারণ করলে কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনী প্রেরণ করলে এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে।

২ কলকাতা থেকে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে বাংলাদেশের দিনাজপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ১৫ মাইল দূরে নকশালবাড়ী নামক এলাকাটি অবস্থিত। ১৯৬৭ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে এখানে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল বলে এই বিদ্রোহকে নকশালবাড়ী কৃষক অভ্যুত্থান বা নকশালবাড়ী কৃষক বিদ্রোহ বলে। নকশালবাড়ী কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এক জোতদার কর্তৃক এক গরিব বর্গা কৃষককে উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঈশ্বর তিরকী নামে এক গরিব কৃষককে এক জোতদার শক্তি প্রয়োগে জমি থেকে উচ্ছেদ করলে ঈশ্বর তিরকী আইনের আশ্রয় নেয়। আদালত ঈশ্বর তিরকীর পক্ষে রায় দিলে সে জমিতে চাষ দিতে যায়। জমিদার ও তার লোকজনেরা শক্তি প্রয়োগ করে পুণরায় ঈশ্বর তিরকীকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে। এর ফলে গবির ও ভূমিহীন কৃষকরা ক্ষুব্ধ হন এবং ভূমিহীন কৃষকরা জমি দখল করেন এবং জোতদার ও মহাজনদের উপর হামলা শুরু করেন। ফলে ভূমিহীন কৃষকদের জয় হয় এবং সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। [বিস্তারিত দেখুন, আমজাদ হোসেন, *op.cit.,* পৃ. ১৩৮।]

এই কমিটির কোন প্রভাব দেখা না গেলেও পূর্ব বাংলায় পার্টির কার্যক্রম দ্রুত বিকাশ ঘটে। কারণ, পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ছিল মূলত কলকাতায় অনুষ্ঠিত সিপিআইয়ের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনীতি। পৃথকভাবে বিশেষ কোন রণনীতি বা রণকৌশল গ্রহণ করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জয়নাল আবদীন উল্লেখ করেন,

> দ্বিতীয় কংগ্রেসের লাইন নিয়েই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি অগ্রসর হয় এবং স্লোগান উঠে ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়। তাই সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলে এই সরকারকে হঠাও। এ সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা মনিসিংহের নেতৃত্বে গারো-হাজংদের টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলন পুনরায় জঙ্গি সশস্ত্ররূপে শুরু হয়। এসব আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ সরকার একদিকে দমন পীড়ন এবং অন্যদিকে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। ... এসবের ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পার্টি আত্মরক্ষার পর্যায়ে তথা পার্টির নেতারা আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। পার্টির প্রকাশ্যে কাজ করার তেমন সুযোগই থাকে না। এই পরিস্থিতিতে ১২ শ মাইলের দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা, সর্বোপরি প্রায় সব নেতাই আত্মগোপনে থাকার কারণে পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কলকাতার বৈঠক ছাড়া কখনোই একত্রে বসতে পারেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিজ উদ্যোগেই এগোতে হয় এবং বাধা-বিচ্যুতি ধরা পড়ার পর জোনাল কমিটি ভেংগে দিয়ে পূর্ব বাংলার সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন নেপাল নাগ।[১]

[১] জয়নাল আবদীন, *op.cit.,* পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯-৫০ সালে মুসলিম লীগ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে অবিরামভাবে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশ) রাজশাহী কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর মুসলিম লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পুলিশের গুলিবর্ষণে ৭ জন কমিউনিস্ট নেতা নিহত হন এবং ৩১ জন নেতা গুরুতরভাবে আহত হন। তারপরও ১৯৫০ সালে ইলা মিত্র ও তাঁর স্বামী রমেন মিত্রের নেতৃত্বে নাচোল বিদ্রোহ[১] সংঘটিত হয়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহির এবং প্রখ্যাত উর্দুকবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজসহ কয়েকজন নেতাকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। ফলে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম অঙ্গ-সংগঠন যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে এই সংগঠনের কর্মপ্রচেষ্টা সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে এ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সরকার বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন।

---

[১] নাচোল বিদ্রোহ হলো ১৯৪৯-৫০ সালে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নাচোল উপজেলার সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ। সে সময়কার তেভাগা, নানকার এবং টঙ্ক আন্দোলনের মতোই নাচোল বিদ্রোহটিও সংগঠিত করেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা। তাঁরা সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের বৈপ্লবিক সংঘটনার একটি কৌশলগত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেন। একই জমি বংশপরম্পরায় চাষাবাদ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ সাঁওতালের ঐ জমির উপর কখনও কোন স্বত্ত্বাধিকার স্বীকৃত হয়নি। জোতদারগণ ফসলের মাধ্যমেখাজনা আদায় করতো। প্রথা অনুযায়ী ফসল কাঁটার সময় ক্ষেতে কর্মরত প্রতিটি সাঁওতাল কৃষক প্রতি কড়ি আড়ি ফসল কাটার বিনিময়ে তার ভাগ অনুযায়ী তিন আড়ি ধান পেত, যা তাদের নিজেদের অথবা কামলাদের মাধ্যমে পরে মাড়াই করতে হতো। আধিয়ার (বর্গা চাষী) উপজাতসহ তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক জোতদারদের দিতে হতো। কমিউনিস্ট কর্মীরা এই শোষণ ও চাষিদের অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করেন। এর ফলে প্রথা অনুযায়ী তিন আড়ি ধানের পরিবর্তে চাষিদেরকে শ্রম-ভাড়া বাবদ কুড়ি আড়িতে সাত আড়ি ধান প্রদানে জোতদারদের সম্মত হতে হবে এবং আধিয়ারদের মতো জমি চাষের জন্য তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দিতে হবে। এ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে। ফলে বহু পুলিশ নিহত হয় এবং জোতদারদের ঘরবাড়ি লুট হয়। (বিস্তারিত দেখুন, *বাংলাপিডিয়া বংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৫, *op.cit.,* পৃ. ২৬।)

এভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে পূর্ব বাংলায় যে সকল কমিউনিস্ট পার্টি, সংগঠন ও গ্রুপ গড়ে উঠে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি, সংগঠন ও গ্রুপ-এর কর্ম পরিকল্পনা হলোঃ

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)

পিকিংপন্থি নামে পরিচিত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (এম-এল) নেতৃত্বে ছিলেন সুখেন্দু দস্তিদার, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক প্রমুখ। এই দল প্রথমদিকে নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও চীনের সমর্থনের কারণে পরবর্তীতে দ্বিধাহীনভাবে তা সমর্থন করতে থাকেন। এই দলের প্রধান বিষয়বস্তু হলো: 'সমস্ত যুগ ধরে বিপ্লবী মার্ক্সবাদী লেনিনবাদীদের আওয়াজ হবে, নির্বাচন বয়কট কর এবং গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের অঞ্চল তৈরি কর'।

পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি, এম-এল) হতে বের হয়ে আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন আহমদ, দেবেন সিকদার, আবুল বাশার গঠন করেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। এই দলের নেতারা নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকার, ও মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে ত্রিমুখী যুদ্ধ পরিচালনা করে। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি যশোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার দোসর রাজাকার বাহিনী এবং কোথাও কোথাও মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (ইপিসিপি, এম-এল) হতে কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকর খান রনো ও রাশেদ খান প্রমূখ নেতা বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি নামে একটি উপদল গঠন করেন। এই দলের নেতারা নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং নিজেদেরকে 'নকশালপন্থি' হিসেবে তুলে ধরেন। নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই দলের নেতারা বাংলার মাটিতেও অনুরূপ বিদ্রোহ ঘটাতে চেষ্টা করেন। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য রেখে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ঘটনার পর তাঁরা ভারতে চলে যান।

পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন

১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি বাংলাদেশের একজন কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা সিরাজ সিকদার সমমনা কয়েকজনকে নিয়ে 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' প্রতিষ্ঠা করেন, যার লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ অভিমুখে যাত্রা করার লক্ষ্যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করা। এই দল নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন করে। ১৯৭০ সালে সিরাজ সিকদারের বিপ্লবী পরিষদ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পাকিস্তানি প্রশাসন ও শেণী শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা অপারেশন চালায় এবং ১৯৭০ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ জেলা ও ময়মনসিংহে স্বাধীন পূর্ব বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল জয় লাভ করলেও সিরাজ সিকদার ও তার সংগঠন পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন স্পষ্টত

পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান নেয়। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানায় এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে সিরাজ সিকদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি খোলা চিঠিতে বলেন, ছয় দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন করে। পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের প্রতি যে প্রস্তাবগুলো করে সেগুলোতে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করার কথা বলা হয়। একইভাবে পূর্ব বাংলার কৃষক-শ্রমিক, প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি-সংবলিত স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করার কথাও বলা হয়। এছাড়া পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার জন্য শ্রমিক-কৃষক এবং প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'জাতীয় মুক্তি পরিষদ' বা 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' গঠন করে প্রকাশ্য ও গোপন, শান্তিপূর্ণ ও সশস্ত্র, সংস্কারবাদী ও বিপ্লবী পদ্ধতিতে সংগ্রাম করার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে জয়নাল আবেদীন উল্লেখ করেন,

> ১৯৪৮-৫২ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের বা সাংবিধানিকভাবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য যে ভাষা আন্দোলন হয়, কডিনিস্ট পার্টি

> তাকে শুধু সমর্থনই জানায়নি বরং কমিউনিস্ট কর্মীরা অর্থাৎ যুবলীগ ও ছাত্রফেডারেশনের নেতা-কর্মীরা এই দাবির সমর্থনে আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ঢাকা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশ নিয়েছিলেন আবদুল মতিন (ভাষা মতিন), মোহাম্মদ তোয়াহা, মুহাম্মদ তকিয়্যুল্লা, শহীদুল্লাহ কায়সার, সাদেক খান, গাজিউল হক, লতিফ চৌধুরী, মাহবুব জামাল জাহেদী, ড. আলীম চৌধুরী, মৃণাল বাড়রি, আবদুস সত্তার, হাসান হাফিজুর রহমান, মোখলেসুর রহমান, আহমদ রফিক, ড. জাহিদ, ড. মঞ্জু, ড. মওলা, ড. আকমল, ড. মাহফুজ প্রমুখ পার্টির সদস্য, পার্টির দরদি সমর্থক ও সহানুভূতিশীল লোকেরা।[১]

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভাষা আন্দোলন সম্পন্ন হতে না হতেই মার্চের মধ্যে যুবলীগের শীর্ষস্থানীয় তিন-চতুর্থাংশ নেতা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। কিন্তু কারাগারের বাইরে থাকা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ ১৯৫২ সালের এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের প্রধান আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। অপরদিকে, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (ইপিসিপি) একাংশ ১৯৫২ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের মাধ্যমে কাজ করে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু আওয়ামী মুসলিম লীগে 'মুসলিম' শব্দটি থাকায় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির (ইপিসিপি) অপরঅংশ সাম্প্রদায়িক আদর্শের আশঙ্কায় ১৯৫৩ সালে হাজী মোহাম্মদ দানেশের সভাপতিত্বে পৃথক একটি দল গঠন করেন। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী তাঁর দলে নবাগত কমিউনিস্টদের প্রভাবে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নির্বাহী কমিটিতে নয়জন কমিউনিস্ট নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে দলের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে কমিউনিস্টদের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান

[১] জয়নাল আবদীন, *op.cit.,* পৃ. ২০০।

সরকারের বিতর্কিত প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃবন্দ যুগপৎ আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনা করেন এবং মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের (আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও গণতন্ত্রী দল) সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দেয়। ১৯৫৪ সালে ৯২-ক ধারা[১] জারির মাধ্যমে প্রদেশে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হলে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের সামরিক সরকার সুপরিকল্পিতভাবে নিগ্রহমূলক ব্যবস্থা নেয়।

১৯৫৬ সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে নিকিতা সার্গেইভিচ ক্রুশ্চেভ (*Nikita* Sergeyevich Khrushchev) স্তালিনের বিরুদ্ধে গোপন রিপোর্ট উপস্থিত করে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি থেকে স্তালিনকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন। এই সময় থেকে বিভিন্ন প্রশ্নে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিতর্ক ও মতবিরোধ চলতে থাকে। ১৯৬০ সালে লেনিনের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চীনা নেতরা Long Live Leninism শীর্ষক বক্তব্য প্রচার করেন। এর ফলেই প্রকাশ্যে রুশ (সোভিয়েত)-চীন মহাবিতর্ক শুরু হয়ে যায়। রুশ (সোভিয়েত)-চীন মহাবিতর্ক প্রকাশ্যে এসে পড়লে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই মহাবিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই রুশ (সোভিয়েত)-চীন মহাবিতর্ক বা দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিতে অভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিলে পার্টিতে ভাঙন শুরু হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি মণি সিংহের নেতৃত্বে মস্কোপন্থি ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে চীনপন্থী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের মধ্যে নীতি বিভ্রান্তি,

[১] ১৯৫৪ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ৯২-ক ধারা অনুযায়ী পূর্ব বাংলার কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয় এবং মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হককে নিজ বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হয় এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় ১৬ নেতাকর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নীতি বিচ্যুতি, সুবিধাবাদিতা, কোন্দল ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বহুধাবিভক্তির চিত্র[১] নিম্নরূপ :

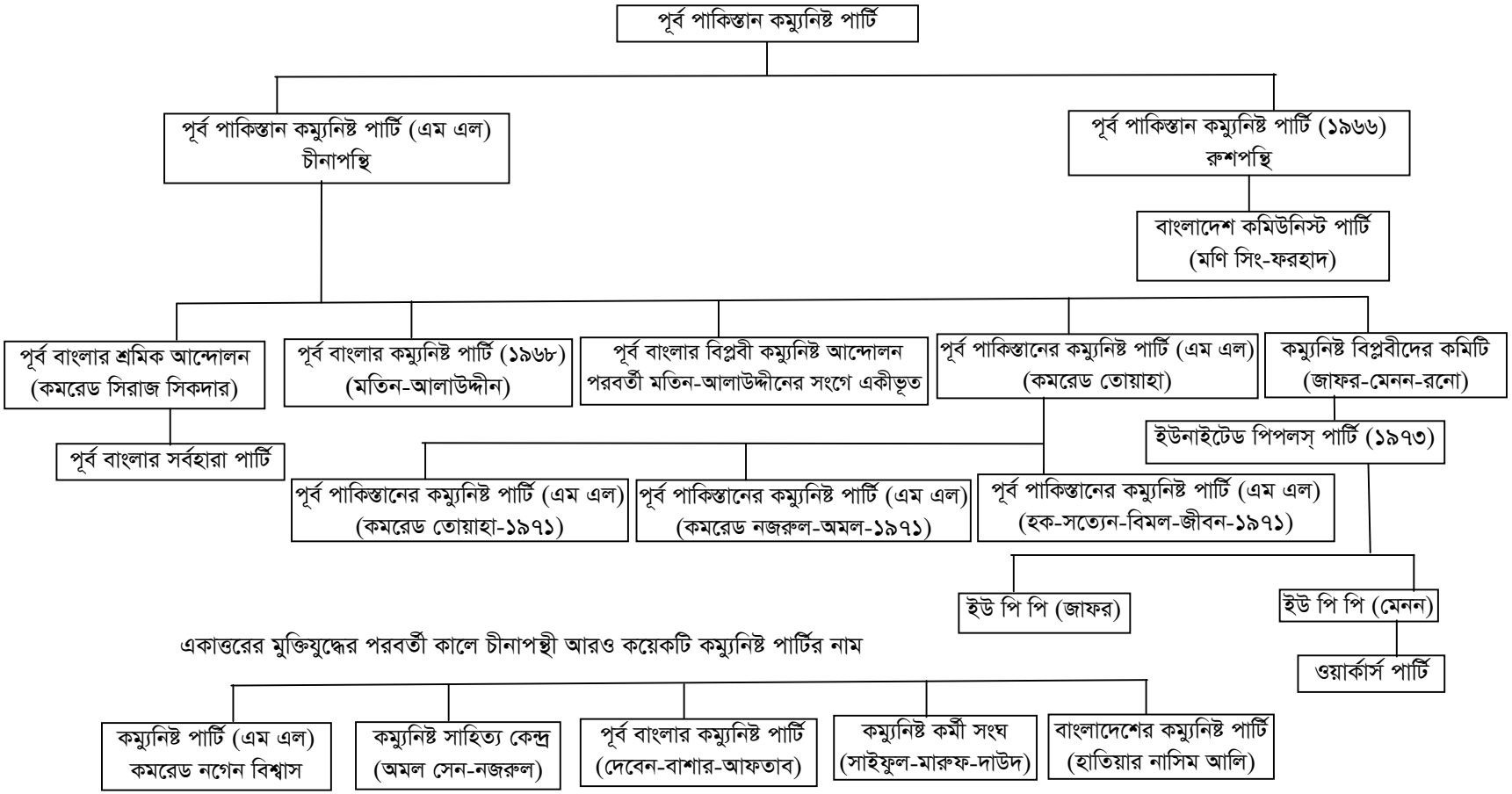

[১] এম আর আখতার মুকুল; *আমি বিজয় দেখেছি:* অনন্যা, ঢাকা; ২০১৪; পৃষ্ঠা- ৩৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির মার্চে যুবলীগের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় নেতা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন। কিন্তু কারাগারের বাইরে থাকা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ ১৯৫২ সালের এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে ড. মো. মাহবুবর রহমান উল্লেখ করেন,

> ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এই সংগঠনটির জন্ম। রাজনীতি সচেতন বামপন্থী ছাত্ররা যেহেতু ছাত্র ফেডারেশনের নামে রাজনীতি করতে সরকারি বাধা-বিপত্তি, জেল-জুলুম-হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছিল এবং যেহেতু ধর্মীয় কারণে মুসলিম ছাত্রলীগেও (১৯৫৩ পর্যন্ত) যোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না; তাই একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী ছাত্র-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। জাতীয়ভিত্তিক এই ছাত্র-সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ছাত্র-ইউনিয়ন নামে সংগঠন বিভিন্ন মফস্বল এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল...[১]

কিন্তু রুশ (সোভিয়েত)-চীন মহাবিতর্ক বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়লে অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি যেমন বিভক্ত হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি পূর্ব পাকিস্তান ইউনিয়ন মস্কোপন্থি ও পিকিংপন্থি এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ছাত্র ইউনিয়নের এই বিভক্তির চিত্র[২] নিম্নরূপ–

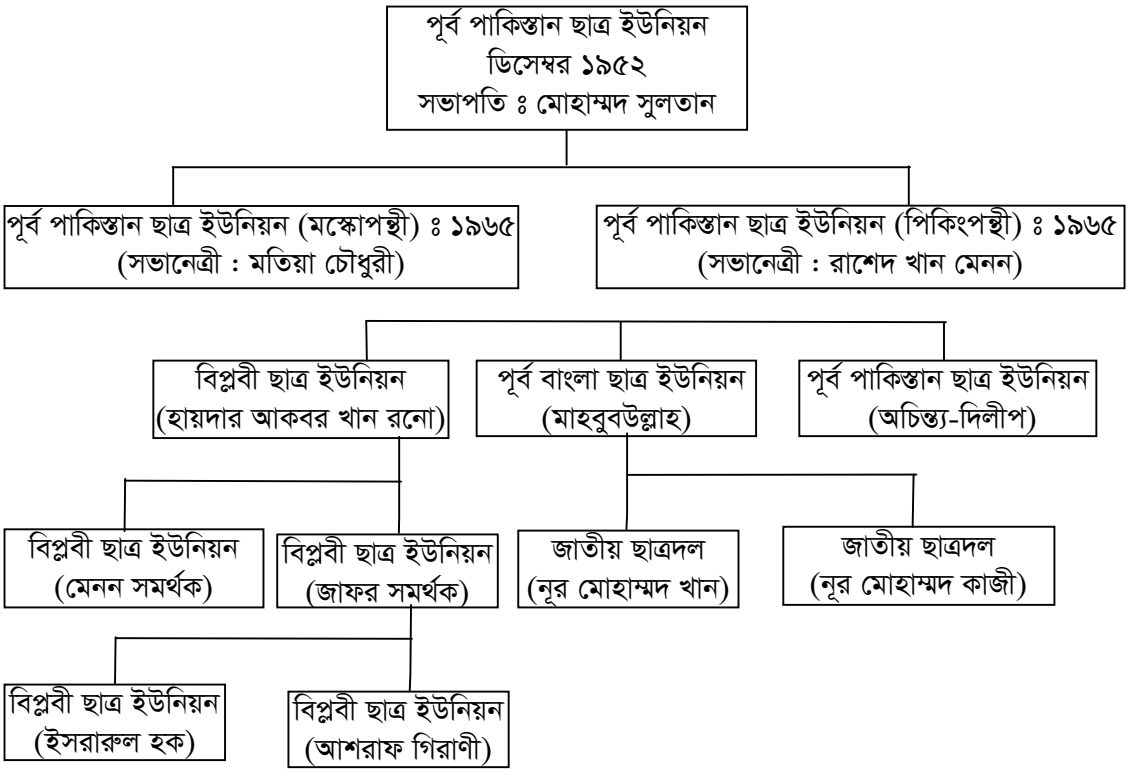

[1] ড. মো. মাহবুবর রহমান; বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯৪৭–৭১; সময় প্রকাশন; ঢাকা-২০০৬; পৃ. ৩৫৯।

[২] এম আর আখতার মুকুল; *op.cit.,* পৃ. ৩৭০।

১৯৬৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে পূর্ব পাকিস্তানে বারীন দত্তকে (আবদুস সালাম) সম্পাদক নির্বাচন করে একটি স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

২.২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ড. নেহাল করিম উল্লেখ করেন,

> প্রথম ভাগে মস্কোপন্থী দলগুলো মণি সিংহ ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কেননা এদের ধারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করতে না পারলে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত না করে অচিরেই সাহায্যের জন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দিকে হাত বাড়াবে। ... দ্বিতীয় অংশে ছিলেন তোহা, দস্তিদার, মতিন, আলাউদ্দীন, টিপু বিশ্বাস, আমজাদ হোসেন ও অন্যান্য, যারা পিকিংপন্থী হলেও নকশালপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এদিকে মোহাম্মদ তোহা ও আবদুল হকের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি ভেঙ্গে দুটি দল হয়। এ সময় সিরাজ সিকদারের শ্রমিক আন্দোলনও তোহা-হক-এর মতন দেশের ভেতরেই পাকিস্তানী বাহিনী এবং কখনো কখনো মুক্তি বাহিনীর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। অপরদিকে তৃতীয় অংশে ছিলেন পিকিংপন্থীদের আরেক অংশ। এদের মধ্যে পূর্ব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টির দেবেন সিকদার ও পূর্ব বাংলার বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (এম.এল)-এর অমল সেন, নজরুল ইসলামের সমন্বয়ে একটি অংশ ও ভাসানী ন্যাপের সমন্বয়ে গড়ে উঠে 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সিরাজ সিকদার ও তোহা তাদের স্ব স্ব দলের নাম পাল্টিয়ে যথাক্রমে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি ও পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন...।[১]

[১] ড. নেহাল করিম, *বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৯৯)*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৬৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সরাসরি নেতৃত্বে একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনী পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে কাজী জাফর আহমদ[১] বলেন,

> ১৯৭১ সালে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কৃষক সমিতি এবং আমাদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলাম। আমি ছিলাম বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি। আমাদের মূল সংগঠন ছিল 'কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'। স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালের ১১ ফ্রেব্রুয়ারী আমরা এই গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। সে বৎসরেরই এপ্রিলে আমরা স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার কর্মসূচি পেশ করি। এতে পরিকল্পিত রাষ্ট্রকে 'পূর্ব বাংলা জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) আয়োজিত এক সভায় অতিথি বক্তা হিসেবে আমরা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করি। এই অভিযোগে পাকিস্তানের সামরিক আইনের অধীনে আমাকে এবং রাশেদ খান মেননকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আদেশ দেয়া হয়, ... ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের আমরা বিরোধীতা করি। ... তাই আমরা নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানাই এবং পাশাপাশি শ্লোগান তুলে ধরিঃ 'শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-জনতা অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'। মাওলানা ভাসানীও নির্বাচন বর্জন করেন এবং ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীনতার আহ্বান জানান। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ে অনেক আশাবাদী হলেও আমরা বলেছিলাম পাকিস্তানী বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠী যে কোন

[১] সভাপতি, বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন (ভাসানীপন্থি ন্যাপ নেতা)।

অজুহাতে পূর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে দেবে না। এজন্যই আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আহ্বান জানাতে থাকি। '৭১-এর মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে আমাদের তৎপরতা বেড়ে যায়। ৭ মার্চ প্রচারিত এক প্রচারপত্রে আমাদের আহ্বান ছিল, 'আঘাত হানো, সশস্ত্র বিপ্লব করো, জনতার স্বাধীন বাংলা কায়েম করো'। ... ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে মুজিবের আলোচনায় আমরা বিরোধীতা করেছিলাম, কারণ সারা পূর্ব বাংলা তখন জ্বলছে একটি মাত্র দাবীতেঃ স্বাধীনতা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের (বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন) উদ্যোগ ২৫ মার্চ বিকেলে পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের ১৩ দফা কর্মসূচী তুলে ধরি। এই সভায় আমরা বলেছিলাম, আলোচনা ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর তাই সারাদেশে অবিলম্বে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। এটাই ছিল তৎকালীন 'পূর্ব পাকিস্তানের' পল্টন ময়দানের শেষ জনসভা। সভাশেষে এক প্রকাণ্ড মিছিলযোগে আমরা শহীদ মিনারে যাই এবং সেখানে শপথ গ্রহণ করি। কর্মীদের পাঠিয়ে দেই তাদের নিজ নিজ এলাকায়। ... জহির রায়হানের গাড়িটিও আমাদের দিয়েছিলেন ঢাকার বাইরে যাওয়ার জন্য। এই গাড়ী নিয়েই আমরা ঢাকা জেলার শিবপুর চলে যাই যেখানে আমাদের সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান ভূঁইয়া গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট গেরিলা বাহিনী। ... শিবপুরে আমরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে নেই। হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেননকে মাওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগের জন্য টাংগাইল পাঠানো হয়। ...পাকবাহিনী মাওলানা ভাসানীর সন্তোষ এবং বিন্নাফৈরের দুটি বাড়ীই জ্বালিয়ে দেয়। মাওলানা ভাসানী আত্মোগোপনে চলে যান। ... মাওলানা ভাসানী আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, তাঁর নির্দেশ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে গণচীনসহ কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রধানদের নিকট তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন সমর্থন চেয়ে। ... বিস্তারিত আলোচনা শেষে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন দেবেন সিকদার (পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি), নাসিম আলী (বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি-হাতিয়ার), অমল সেন (কমিউনিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সংহতি কেন্দ্র), ডাঃ সাইফ-উদ-দাহার (কমিউনিষ্ট কর্মী সংঘ) এবং আমি (কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি)। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগের প্রতি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয় এবং এ ব্যাপারে যোগাযোগের দায়িত্ব লাভ করি আমরা। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় ঘোষণাটি ভারতসহ বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিল। এতে বিভেদের নীতি পরিহার করে সকল বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপিসহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর রনো কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতাযুদ্ধে বামপন্থীদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সাথে বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তিবাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করতে অস্বীকার করেন। কারণ হিসেবে তিনি হক-তোয়াহার নেতৃত্বধীনে কমিউনিষ্টদের শ্রেণী সংগ্রামের এবং স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতার উল্লেখ করেন, তাদের প্রচারপত্রের প্রসংগও টেনে আনেন। আমি বলি যে হক-তোয়াহারা যা করছেন তা নিজেদের দায়িত্বেই করেছেন, এর সাথে বামপন্থীদের বিরাট অংশটি আদৌ জড়িত নয়। আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যেই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কাউকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজউদ্দিন জানান যে তাঁকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর। এই পর্যায়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়, এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদের উপস্থিতি সে অপ্রিয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি। ... আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান মিঃ সুব্রামনিয়াম। তিনি অবশ্য সমগ্র ব্যাপারটিকে 'নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা' হিসেবে বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই আলোচনায় দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনীতিতে বামপন্থীদের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকাসহ বিভিন্ন প্রসংগ এসেছিল। তিনি বারবার আওয়ামী লীগ ও ভারতের প্রতি বামপন্থীদের মনোভাব সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন। আমি বলেছিলামঃ এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান সমস্যা পাকিস্তানের সেনাবাহিনী; এর বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে চাই, আওয়ামী লীগের সাথে মতপার্থক্যসমূহ এখন আমরা তুলে ধরবো না-তাদের সাথে আমাদের সমস্যাসমূহের মীমাংসা আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে করবো, যুদ্ধের মধ্যে বা ভারতের অভ্যন্তরে নয়। ভারতের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা সম্ভাবনার প্রসংগে আমি বলেছিলামঃ ভারতের পক্ষে সেটা উচিত হবে না, আমরা বাংলার মাটিতেই শত্রুদের খতম করবো। স্বাধীনতাকে আমরা ছিনিয়ে আনতে চাই, কারো অনুগ্রহ পেতে চাই না। ... স্বাধীনতা যুদ্ধকালে আমাদের সংগঠনের নীতি ছিল দুটিঃ ১। যেখানে সম্ভব বেংগল রেজিমেন্ট, ই পি আর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের মান্য করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এবং (২) কোথাও তেমন বাহিনী না থাকলে কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যোগদান সম্ভব না হলে আলাদাভাবে 'গেরিলা ফৌজ' গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম ছিল 'গেরিলা ফৌজ'। এর গঠন প্রণালী ছিল-পাঁচ থেকে সাতজন নিয়ে একটি গ্রুপ, কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি স্কোয়াড এবং কয়েকটি স্কোয়াড নিয়ে গঠিত হতো এক একটি আঞ্চলিক ইউনিট। এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ ২৫ মার্চের জনসভাতেই ঘোষণা করা হয়েছিল। ...কেবল সেই সব অঞ্চলেই গেরিলা ফৌজ গঠিত হয়েছিল যেখানে সরকারী মুক্তিবাহিনী (বেংগল রেজিমেন্ট, ইপিআরসহ) ছিল না কিংবা থাকলেও সংকীর্ণতার কারণে আমাদের কর্মীরা ওতে যোগ দিতে পারেনি। দেশের অন্য সকল এলাকায় কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে যুদ্ধ করেছেন-কোন প্রকার দলীয় বিভেদাত্মক কার্যকলাপ তারা চালাননি। সেই প্রেক্ষিতে যুদ্ধশেষে হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমাদের সংগঠনের কর্মী সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার। দেশের অভ্যন্তরে একমাত্র শিবপুর এলাকায় আমাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ শিবির ছিল। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে যুদ্ধকালে যে ক'জন সামরিক অফিসার আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন তাঁরা হলেনঃ মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম এ জলিল। এঁরা

ছাড়াও মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমামের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের কর্মীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়তো। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা অস্ত্রের ব্যবস্থাও করতেন। মেজর জিয়ার জেড ফোর্সে অগাষ্টের দিকে আমাদের প্রায় এক হাজার যোদ্ধা অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের শেষ দিকে আমরা দুটি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলেছিলামঃ একটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম সংলগ্ন সীমান্তের ওপারে এবং অন্যটি কিশোরগঞ্জ সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায়। ...যুদ্ধকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটির পক্ষে সরাসরি নেতৃত্ববা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না, ফলে যেখানে কমিটির যে সংগঠন বেশী শক্তিশালী ছিল সেখানে অন্য সংগঠনের সদস্যরা তার অধীনে মিলিতভাবে যুদ্ধ করতো। সংগঠন হিসেবে আমাদের কমিউনিষ্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি নিজেদের মধ্যে মোটামুটি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতো। যেখানে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি সেখানে পূর্বঘোষিত নির্দেশানুযায়ী কর্মীরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কোন পর্যায়েই সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল স্রোতধারার সাথে আমরা মিশে গিয়েছিলাম। মাও সে তুঙের চিন্তাধারা প্রেরণার অন্যতম উৎস হলেও যুদ্ধকালে গণচীনের ভূমিকার আমরা তীব্র সমালোচনা করেছিলাম। মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদ ছিল আমাদের ঘোষিত শত্রু। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বিশেষ করে ভারতের সাহায্যকে আমরা স্বাগত জানালেও সে প্রশ্নে আমাদের সন্দেহ ছিল, সংশয় ছিল। আমরা কোন পর্যায়েই চাইনি যে ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিক। ভারতের বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন বিশেষ করে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সহযোগিতা আমাদের উপকারে এসেছে। এই সাহায্য ছিল প্রধানত নৈতিক।[১]

[১] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদক), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ* পঞ্চদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০০৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৩৪-১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলায় কমিউনিস্টদের অবস্থান[১] :

১.	কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং)	:	মুজিবনগর সরকারে সমর্থক।
২.	ন্যাপ (মুজাফফর)	:	ঐ
৩.	ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)	:	ঐ
৪.	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)– তোয়াহ	:	বংলাদেশের মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ– ভারতের সাহায্যে নয়।
৫.	শ্রমিক আন্দোলন (সিরাজ সিকদার)	:	পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ– কিন্তু 'ভারতীয় দালাল মুক্তিযোদ্ধাদের' বিরুদ্ধে লড়াই।
৬.	পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল)– আবদুল হক	:	মুক্তিযুদ্ধের নামে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন– অতএব মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই।
৭.	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল)–মতিন আলাউদ্দীন	:	চারু মজুমদারের লাইন সঠিক– সুতরাং বিপ্লবের স্তর হবে সমাজতান্ত্রিক।
৮.	কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (জাফর-মেনন-হায়দার-রনো)	:	মাওলানা ভাসানীকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করে কোলকাতা মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন এবং মুজিবনগর সরকারের নিকট অস্ত্রের আবেদন।
৯.	পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন-বাশার-আফতাব)	:	ঐ
১০.	কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র (অমলসেন-নজরুল)	:	ঐ

[১] এম আর আখতার মুকুল; *op.cit.,* পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।

১১. কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ : ঐ
(সাইফুর-মারুফ-দাউদ)

১২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি : ঐ
(হাতিয়ার)–নাসিম আলী

১৩. ন্যাপ (ভাসানী) : ঐ

১৪. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন : মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সমর্থক।
(অচিন্ত্য-দিলীপ)

১৫. পূর্ব বাংলার ছাত্র ইউনিয়ন : ঐ
(মাহাবুবউল্লাহ)

১৬. পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন : পূর্ব বাংলার মাটিতে থেকে মুক্তিযুদ্ধ।
(হায়দার খান রনো)

২.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের লক্ষ্যে এ দেশের কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা নব উদ্যোমে কার্যক্রম পরিচালন করতে থাকেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্টির নতুন নামকরণ হয় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এবং পার্টি তার ইতিহাসে এই প্রথম প্রকাশ্যে ও নির্বিঘ্নে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ লাভ করে। বিপ্লবী ধারায় শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।[১] ১৯৭২ সালে রচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারটি আদর্শের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক,

[১] *বাংলাপিডিয়া বংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৬, *op.cit.*, পৃ. ৪৫৭।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য ১৯৭৩ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর) সমন্বয়ে গণঐক্যজোট গঠন করা হয়। সিপিবি থেকে ৩ জন সদস্য সহ ১৯ সদস্যবিশিষ্ট জোট-কমিটি গঠিত হয়।[২]

বাংলাদেশের মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দলগুলো তথা কমিউনিস্ট পার্টিগুলো আদৌ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করতে চান কি-না, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার যথেষ্ট প্রস্তুতি এই দলগুলোর আছে কি-না, কোন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা দল পরিচালনা করছেন কি-না, বাংলাদেশের সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক বা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বগুলো তারা কিভাবে লক্ষ্য করছেন এবং কিভাবে সেই মতবিরোধ বা দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটাবেন বা কিভাবে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের ঘটনাবলির ব্যাখ্যা করবেন–সমাধান করবেন? এই বিষয়গুলো বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। তবে নিম্নে এই বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো–

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন চিন্তাবিদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের যেমন রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা ও রণকৌশল বা রণনীতি, তেমনি রয়েছে দল পরিচালনার গঠনতন্ত্র বা মেনিফেস্টো (Manifesto)। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে (১১, ১২ ও ১৩ অক্টোবর ২০১২ ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশম কংগ্রেসে সংশোধিত) উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[৩] আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এই পার্টির লক্ষ্য। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ও নীতিসমূহ রচনায় সচেষ্ট থাকবে। সে ক্ষেত্রে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের চিন্তার বৈজ্ঞানিক মর্মবাণী ও বিষয়বস্তুকে অনুসরণ ও বিকশিত করে অগ্রসর হওয়ার ধারাকে পার্টির মর্তাদর্শগত ভিত্তি রূপে বিবেচনা করবে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে পার্টি মার্কসীয় চিন্তা অনুসরণে যে কোন প্রকার মতান্ধতা, গোঁড়ামী, শাস্ত্রবদ্ধ চিন্তার প্রবণতা প্রভৃতি হতে মুক্ত

---

১ বিস্তারিত দেখুন, প্রস্তাবনা, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, (ঢাকা, *আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮, পৃ. ১*।

২ *বাংলাপিডিয়া বংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৬, *op.cit.,* পৃ. ৪৫৭।

৩ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র; বিস্তারিত দেখুন, http://www.cpbbd.org/printPaper.php?serial=22

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে মার্কসীয় সূত্র অনুসারে তত্ত্ব ও প্রয়োগকে সকল সময় সৃজনশীলভাবে অগ্রসর ও বিকশিত করতে সচেষ্ট থাকবে। এই পার্টি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে এবং দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সমাজ বিকাশের ধারার বিশিষ্টতা ও জনগণের সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুনির্দিষ্ট বাস্তবতাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে এই পার্টি চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি অনুসারে সুনির্দিষ্ট সময়ের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ করবে। পার্টি দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা ও জনগণের জীবনে বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, দেশবাসীর বৈষয়িক সম্পদের ও আত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করার জন্য সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাবে। এছাড়া বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, গণতন্ত্রের মূল্যবোধ, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়ে তোলা এবং বিকশিত করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করবে। বাক্-ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য পার্টি কাজ করে যাবে। পার্টির লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী ধারায় আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালনায় পার্টি সর্বতভাবে নিয়োজিত থাকবে। পার্টি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়াস চালাবে। তছাড়া এই পার্টি প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার ও প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বিবেকের স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকবে। পার্টি কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, আঞ্চলিকতা, স্বৈরতান্ত্রিকতা প্রভৃতি পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা ও এসবের ধারক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করবে এবং সুসভ্য, মানবিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মূল্যবোধ ও শক্তিসমূহকে দৃঢ়ভিত্তিক করতে সচেষ্ট থাকবে। এমনকি এই পার্টি সারা দুনিয়ার মানব সভ্যতার সাধারণ স্বার্থ রক্ষা ও তা অগ্রসর করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকবে। মানবমুক্তির মহতি আদর্শ সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ এই পার্টি প্রাণের অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কা থেকে মুক্ত শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য সংগ্রাম করে যাবে। এই লক্ষ্যে পার্টি আণবিক ও তাপ পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদের সম্পূর্ণ অবসান, সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতির জন্য দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করবে। সর্বপরি এই পার্টি পৃথিবীর দেশে দেশে শোষিত-বঞ্চিত মানুষ ও নিপীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও

একাত্মতা প্রকাশে দ্বিধাহীন থাকবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, জায়নবাদ প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম পরিচালনা করবে। পার্টি মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও প্রগতির ক্ষেত্রে সকল অবদান ও সাফল্যকে যথাযথ মূল্য দেবে। পার্টি জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করবে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষত প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকবে এবং পার্টি প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ স্বাধীনতা, সমমর্যাদা ও মতের বৈচিত্র্যের স্বীকৃতির ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সকল শক্তির ঐক্য-সংহতি জোরদার করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের শক্তি ও অবদানকে সংহত করার জন্য বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি প্রচেষ্টা চালাবে। পার্টি একই সঙ্গে বিশ্ব পরিসরে মেহনতি মানুষের আন্দোলনের অন্যান্য অংশ এবং প্রগতিশীল ও শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের স্বপক্ষের সকল শক্তির ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার প্রচেষ্টা চালাবে।

এই গঠনতন্ত্র বা মেনিফেস্টো অনুসারে দল পরিচালনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট রাজনৈতিক দলগুলো সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঐতিহাসিক প্রয়োগ ও প্রসারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে ড. নেহাল করিম বলেন,

> সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রচুর সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রীদের কারণে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন প্রবল ও ব্যাপক হতে পারেনি। এর অনেক কারণের মধ্যে রয়েছে ১. তত্ত্বগত বিরোধ, ২. আন্তর্জাতিকতাবাদ, ৩. মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্ব, ৪. উপ-দলীয় কোন্দল, ৫. বুর্জোয়া দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি ও সুবিধাবাদীদের অন্তর্ঘাতমূলক কর্মতৎপরতা এবং ৬. দল ও নেতার নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা।[১]

[১] ড. নেহাল করিম, *বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৯৯)*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৬৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৮৩-১৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.১ মুজিববাদ ঃ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে সূচনা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রায়োগিক দিক অনুসারে বিভিন্ন দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিকাশের স্তর অনুযায়ী শ্রেণী সমাজ থেকে শ্রেণীহীন সমাজে উত্তরণের তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারিত হয়। তাইতো বর্তমান কালের যে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধান করার জন্য মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করা যায়। মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোকেই বর্তমান সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমস্ত ঘটনার কারণগুলো সম্পর্কে এবং একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য কী করা প্রয়োজন বা কোন ধরনের নীতির সপক্ষে সংগ্রাম করা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কেও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমকালীন প্রয়োগই তার বৈজ্ঞানিক চরিত্র উদ্ঘাটন করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কেবলমাত্র একটি মতবাদ বা তত্ত্ব নয়, ইতিহাস কী করে সৃষ্টি করতে হয় সে সম্পর্কীয় মতবাদ বা তত্ত্বও বটে। কাজেই যে বিপ্লবী শ্রেণী এই সমকালীন যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করছে তাদের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক কর্মনীতির ভিত্তি সংক্রান্ত মতবাদ বা তত্ত্ব হলো কার্ল মার্ক্স-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

পৃথিবীতে বহু চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তির চিন্তাধারা পরবর্তীতে দার্শনিক মতবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন, কমিউনিজম বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অগ্রনায়ক কার্ল মার্ক্স-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'মার্ক্সবাদ', রাশিয়ায় কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক লেনিন-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'লেনিনবাদ', চীনে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার পিতৃপুরুষ মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'মাওবাদ', ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'গান্ধীবাদ', পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'জিন্নাহবাদ', মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'নাসেরবাদ', স্বাধীন কমিউনিস্টপন্থি যুগোস্ল্যাভিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল জোসেফ ব্রজ-এর চিন্তাধারা নিয়ে 'টিটোবাদ' পরিচিতি লাভ করেছে। একইভাবে স্বাধীন

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তাধারা নিয়ে 'মুজিববাদ' নামে একটি মতবাদ গড়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন,

> "মুজিববাদ বাঙলাদেশে সমাজ বিপ্লবের দর্শন। —সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালীর জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙলার বিপ্লববাদ যে ধারায় বিকাশলাভ করে, মুজিববাদ তার ঐতিহাসিক পরিণতি, তার বৈজ্ঞানিক রূপ।"[১]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পরও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নানা ধরনের দুর্যোগ দুর্বিপাকের মধ্যেও একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক শক্তি ছিল, যদিও তারা কখনো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। বরং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) দীর্ঘদিন তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দল ছিল। তারপরও তারা গোপনে (Underground) অবস্থান করে দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। দেখা যায় যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (Communist Party of India) ভারতের নেহেরু সরকার থেকে শুরু করে ইন্দিরা সরকারকে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ে ধরে রাখতে পেরেছিল। একইভাবে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে আওয়ামী লীগে এবং স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগ সরকারে তারা প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করেন এং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তাচেতনাকে তথা রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ দার্শনিক চিন্তনকে মুজিববাদ বলে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা–এই চারের নির্যাসই নিয়েই মুজিববাদ। মুজিববাদী বিপ্লববাদকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ

১। মুজিববাদ—বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার স্তর;

২। মুজিববাদ—জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের স্তর এবং

৩। মুজিববাদ—শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সোনার বাংলা নির্মাণের স্তর।

---

[১] খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *মুজিববাদ;* ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ২০৭।

Dhaka University Institutional Repository

১। মুজিববাদ—বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতার স্তর

বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও তার বিকাশ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অর্জন এবং স্বাধীনতার নিরাপত্তা ও সংহতি বিধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জাতীয় ঐক্য। এই জাতীয় ঐক্যই একটি দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি। কারণ পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যই হলো শোষণমুক্তির মূলমন্ত্র। পৃথিবীর সকল দেশেই জাতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি হলো দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র এবং মেহনতি শ্রেণীর নিপীড়িত জনগণের ঐক্য। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি জনসমষ্টি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক এবং বাকি অংশ কৃষি অর্থনীতির বিচারে পেটি-বুর্জোয়া। এদেশের শ্রমিক, মেহনতি শ্রেণীর দরিদ্র জনগণ এবং সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত। এদেশের শ্রমিক, মেহনতি শ্রেণীর জনগণ, ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক শ্রেণী এবং জাতীয় স্বার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশ ও শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য পেশ করেন বলিষ্ঠ কর্মসূচি ও মতবাদ। ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণে তাঁর বলিষ্ঠ কর্মসূচি ও মতবাদ 'মুজিববাদ' নামে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসন, ১৯৪৭ সালে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসক ও শোষকচক্রের বঞ্চনা ও প্রতারণা বাংলার সংগ্রামী জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তোলে। ফলে সংগঠিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের ৯২-ক ধারা বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণতন্ত্রের আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবিতে ঐতিহাসিক এগারো দফার গণ-ছাত্র আন্দোলন। এই সকল আন্দোলনে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণের ভূমিকা বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী নেতৃত্ব ও অগ্রগামীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কাজেই বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণের সামগ্রিক শ্রেণী চরিত্র হলো নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের আপসহীন সংগ্রামী শ্রেণী চরিত্র। আবার বাংলাদেশের সংগ্রামী দল ও নেতৃবৃন্দের শ্রেণী চরিত্র হলো পেটি-বুর্জোয়ার দেশপ্রেমিক কিন্তু সুবিধাবাদী ও দোদুল্যমান শ্রেণী চরিত্র। এই সংগ্রামী জনগণের ঐক্যের প্রতি গভীর আস্থাবান হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই ঐক্যের স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে পল্টনের জনসভায় যেখানে

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। এই পল্টন জনসভার উদ্যোক্তা ছিলেন ভাসানীপন্থি ন্যাপ, আতাউর রহমান খানপন্থি জাতীয় লীগ, মোহাম্মদ সোলায়মানপন্থি কৃষক শ্রমিক দল এবং পীর মোহসেন উদ্দিন ওরফে পীর দাদুমিয়াপন্থী জমিয়তুল ওলামায়ে ইসলাম।[১] স্বাধীনতার দাবিতে মুজিববাদের প্রাণোন্মাদনাকারী স্লোগান উঠে—'তোমার দেশ আমার দেশ–বাংলাদেশ, বাংলাদেশ'। 'তোমার আমার ঠিকানা – পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'। 'জয় বাংলা।' কাজেই মুজিববাদে জাতীয় ঐক্যের সংগ্রাম ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে একটি শোষণহীন, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, শান্তিকামী ও প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হিসেবে।

২। মুজিববাদ—জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের স্তর

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ মুজিববাদের জাতীয় স্বাধীনতার স্তর স্থাপিত হওয়ার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুজিববাদের জয় হয়। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ ও প্রাণহানীর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জণগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। সতের শতকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ইংল্যান্ডে।[২] এরপর অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক হতে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে (বিশেষ করে

---

[১] খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, *মুজিববাদ;* ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ২২৬।

[২] ইংল্যান্ডের রাজক্ষমতায় রাজা ও অন্যান্য সামন্ত প্রভু–লর্ড ও ব্যারনদের ক্ষমতা খর্ব, ইংল্যান্ডের ভূমিদাস কৃষক বা সার্ফদের ন্যূনতম মানবিক অধিকারের স্বীকৃতি, শ্রমিক শ্রেণীর কাজ ও মজুরির নীতি, ধনিক ও শিল্পপতি বুর্জোয়াদের স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ দান এবং পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা–এই ছিল মোটামুটিভাবে ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র।...ইংল্যান্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র পক্ষে ছিল বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও শিল্পপতি শ্রেণী–বুর্জোয়া শ্রেণী। শত্রুপক্ষে ছিল স্বৈরতন্ত্রী রাজা ও তাঁর শ্রেণী স্বার্থের অনুচর জমিদার, লর্ড, ব্যারন ও পাদরীরা–সামন্ত শ্রেণী। (বিস্তারিত দেখুন, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৩৬।)

আমেরিকা, ফরাসি, ভারত, চীন ও তুরস্কে)[১] **বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব** অনুষ্ঠিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এক এক দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পার্থক্য থাকলেও বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বিচারে প্রতিটি বিপ্লবই ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুত্থানে বিশ্বের বাস্তব অবস্থা ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ এখন আর প্রগতিশীল নয়, বরং তা প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎমুখী চিন্তাধারা। কারণ বিশ্বব্যাপী এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থায় হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষের মুক্তির পথ। **সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব** অনুষ্ঠিত হয় বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির নেতৃত্বে এবং অন্যান্য সংগ্রামী, মেহনতি ও নিপীড়িত মানুষের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সমর্থনে ধনিক শ্রেণী ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব থাকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। যেমন- সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও কিউবা প্রভৃতি হলো সমাজতান্ত্রিক দেশ। **জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব** অনুষ্ঠিত হয় শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে কৃষক, সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী, পেটি-বুর্জোয়া ও দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমর্থনে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বও থাকে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। তবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে কমিউনিস্ট নয় এমন দেশপ্রেমিক শ্রেণী, দেশপ্রেমিক বুর্জোয়া শ্রেণী, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর অংশগ্রহণ থাকে। চীন, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় দেশে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় সমাজের মধ্যবর্তী স্তর তথা পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। এ ধরনের বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে ধনিক শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী এবং শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি শ্রেণী। তবে এ ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট, অন্যান্য বিপ্লবী ও প্রগতিশীল

[১] আমেরিকায় বিপ্লবীদের পক্ষে ছিল আমেরিকায় বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের ধনীক শ্রেণী—ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী। শত্রুপক্ষে ছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও ব্রিটিশ ধনীক শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণী। ফরাসি দেশের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রপক্ষের নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়াদের হাতে, কারণ তাঁরা ছিলেন অর্থ ও সংগঠনের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী। শত্রুপক্ষে ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী রাজা-জমিদার-ব্যারন ও পাদরীরা। ভারত, চীন ও তুরস্কের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় সেদেশের অভ্যন্তরীণ সামন্তশক্তি সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল বুর্জোয়া ও উঠতি বুর্জোয়াদের হাতে। বিপ্লব শেষে ক্ষমতায় আরোহণ করে বুর্জোয়া শ্রেণী। (মিলিয়ে দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।)

শক্তির সার্বিক সমর্থন থাকে। নাসেরের নেতৃত্বে মিশর, ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবা, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত, নে উইনের নেতৃত্বে বার্মা (মায়ানমার), বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো দেশকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ করা। এজন্যই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণ, তেমনি তার রাজনৈতিক লক্ষ্য জাতীয় গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে প্রলেতারীয় বা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে রূপান্তর। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক রূপ বা প্রকৃতি ও চরিত্র হলো :

১। বিশ্ব পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদী প্রভাবে বিলোপ সাধন করা;

২। একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ ও ভারী শিল্পকে জাতীয়করণ করা;

৩। সামন্তবাদ ও সামন্তবাদের অবশেষসমূহ বিশেষ করে জোতদার, মহাজন, আমলা ও তাদের দালাল শ্রেণীকে সমাজ জীবন থেকে উৎপাটন করা;

৪। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা;

৫। ইস্পাত, ধাতব এবং বিদ্যুৎ শিল্পের মতো মৌলিক ও ভারী শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

৬। দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সরকারি কর্তৃত্বে আনয়ন করা;

৭। বিদেশি পুঁজি বিলোপসাধন করা এবং এর সঙ্গে জড়িত সাম্রাজ্যবাদের সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে দেশের মুক্তিসাধন করা;

৮। স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা এবং ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করা;

৯। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা;

১০। শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর চিন্তার স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ দান করা;

১১। দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। কাজেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে বাংলাদেশে মুজিববাদের আদর্শ নীতিতে যে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার চরিত্র ও প্রকৃতি ছিল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুরূপ।[১]

বাংলাদেশে বিপ্লবের মূলসূত্র ও প্রাণশক্তি হলো মুজিববাদ। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন,

> "সংগ্রামী বাঙলার সংগ্রামী চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে মন্ত্রে শতাবিভক্ত বাঙালী জাতিকে জিন্নাবাদ ও পাকিস্তানবাদের বিরুদ্ধে সংহত করেন, ঐক্যবদ্ধ করেন, তাঁর সেই ঐক্যের মূলমন্ত্র মুজিববাদ,—শ্মশান বাংলাকে সোনার বাঙলায় রূপান্তরের তাঁর স্বপ্ন, তাঁর জীবন দর্শন।"[২]

দেশ গড়ার কাজে দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে হয়। কারণ নেতার চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড় এবং দেশ ও দেশের জনগণই সবার ঊর্ধ্বে। তাইতো বাংলাদেশে একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের হীন চক্রান্তের মুখোশ উম্মোচিত হওয়ার ফলে এদেশে সমাজতন্ত্র বিনির্মাণের বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়। কিন্তু বিপ্লবী শ্রেণী চেতনা, বিপ্লবী সংগঠন ও সমাজতান্ত্রিক কর্মীর অভাবে দ্রুতগতিতে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে পর্বত প্রমাণ বাঁধা থেকে যায়। এহেন বাস্তব পরিস্থিতিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়নের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজ তথা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণ কিংবা সোনার বাংলার বাস্তব রূপায়ণের পথে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ বাংলদেশকে তার অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন,

> বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়ে চলেছে মুজিববাদ ও আওয়ামী লীগ। ... মুজিববাদের শ্রেষ্টতম মিত্র মহান সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, সমাজতান্ত্রিক শিবির ও জোটনিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্ব। ... বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শ্রেণীর সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ তার শক্তি। ... কাজেই বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শ্রেণী ও দলের সক্রিয় সমর্থনে জাতীয় গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

> সম্পাদন এবং শেষে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নাসেরবাদের মতোই মুজিববাদের পক্ষে সম্ভব। কারণ ততোদিনে বৈপ্লবিক শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্র কৃষক ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সুসংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসবে অনেক সামনে। মুজিববাদের এরূপ অবদান হবে বাঙলার জনগণের জন্যে ঐতিহাসিক অবদান।[১]

৩। মুজিববাদ—শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বা সোনার বাংলা নির্মাণের স্তর

স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং দেশে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও 'সোনার বাংলা' রূপায়ণের অপরিহার্য শর্ত হলো জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং স্বনির্ভরশীল জাতীয় অর্থনীতির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন। মুজিববাদ বাংলার শ্রমিক ও মেহনতি শ্রেণীর সঙ্গে ভূমিহীন, দরিদ্র ও মাজারি কৃষক শ্রেণীর সার্বিক মঙ্গল বিধানে নিয়োজিত ছিল। এইজন্যই মুজিববাদের এক একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে তৈরি হয় এক একটি নতুন অবস্থার। এর সঙ্গে সামাজিক আবর্তন, বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটে। ফলে পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও সমাজব্যস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং উদ্ভব হয় নতুন নতুন বাস্তব পরিস্থিতির। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের প্রভাব পড়ে।

মুজিববাদে সোনার বাংলা স্তরের রাজনৈতিক পরিচয় হলো শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্তর। এই স্তরের সামগ্রিক ভিত্তি হিসেবে সমগ্র দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দল ও মতের সকল মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য সাধনকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস বলেন,

> এভাবে পুরাতনের সঙ্গে পুরাতনের, পুরাতনের সঙ্গে নতুনের, নতুনের সঙ্গে নতুনের কিংবা নতুনের সঙ্গে আগামীদিনের অগ্রিম চিন্তাধারার মধ্যে ঘটেছে যে দ্বন্দ্ব, তার ফলে আবার উদ্ভব হচ্ছে নতুন নতুন পরিস্থিতির। সেই সঙ্গে নতুন নতুন শিক্ষা ও নতুন নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ এই প্রক্রিয়ার গতি কেউ পারবে না রোধ করতে। এ গতি

[1] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

ইতিহাসের নিয়ম, ইতিহাসের ধারা। এ গতি সমাজ বিজ্ঞানের বিজ্ঞান-ভিত্তিক অলঙ্ঘনীয় গতিধারা।[১]

এই গতিধারাতেই বাংলাদেশে আবির্ভাব ঘটে মুজিববাদের। তাইতো বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূচনালগ্ন হলো মুজিববাদ। কারণ মুজিববাদ বাংলাদেশে একটি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে কিন্তু তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। মুজিববাদের লক্ষ্য ও আদর্শ তথা দর্শন বাস্তবায়নের আগেই পুঁজিবাদী শক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। ফলে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ সূচনালগ্নেই থেমে যায়। কারণ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক সরকারের কঠোর নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন। পার্টির বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বহু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়। ১৯৭৭ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং পার্টির নেতা ও কর্মীদের মুক্তি দেয়া হয়। ফলে ১৯৭৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি পাঁচটি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৯০ সালে সামরিক শাসক এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের কডিনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ব্যাপক সংকটের মধ্যে পতিত হয়।

৩.২ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ

মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক মতবাদ এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন। আগেই বলা হয়েছে যে, মার্ক্সবাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। কারণ মার্ক্সবাদে বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি হলো দ্বান্দ্বিক আর ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এর ধারণা ও তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী। আর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

নীতিগুলো সমাজ জীবনের অনুশীলনে প্রয়োগ করাকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। অর্থাৎ সমাজ জীবনের ধারা, সমাজ ও তার ইতিহাসের অনুশীলনে দ্বান্দ্বিক নীতিগুলোর প্রয়োগই হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্ক্সের মতে, "মানব মনের মধ্যে বস্তুজগৎ প্রতিফলিত হয়ে চিন্তার যে বিভিন্ন প্রকরণে রূপান্তরিত হয়, 'ভাব' ("the Idea") তা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১] চিন্তার স্ববিরোধগুলো প্রকাশ করা এবং পরস্পর বিরোধী মতের সংঘাত হলো সত্যে পৌঁছানোর শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলা হয়। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– বস্তুজগৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং সামগ্রিকভাবে সুসংহত, যার মধ্যে বস্তুসমষ্টি ও ঘটনাগুলো পরস্পরের সাথে প্রকৃতিগতভাবে সম্পর্কযুক্ত, তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কোন ঘটনাকে পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা আর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে দেখা হবে না। কারণ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসারে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে বিকাশের প্রক্রিয়া ঘটনার সুসামঞ্জস্য প্রকাশ হিসেবে ঘটে না, তা ঘটে থাকে বস্তু ও ঘটনার অন্তর্নিহিত বিরোধের প্রকাশ হিসেবে, এই সকল বিরোধের ভিত্তিতে বিরুদ্ধ ধারাগুলোর একটি সংঘাত হিসেবে। এ প্রসঙ্গে লেনিন (V. I. Lenin) বলেন, "প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বতত্ত্ব হলো বস্তুর একেবারে মর্মে অবস্থিত অন্তর্নিহিত বিরোধের অধ্যয়ন।"[২]

বংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী মার্ক্সবাদী দলগুলোর জাতীয় রাজনীতিতে সংকট চলছে বহুকাল ধরে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে এই সংকট শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন, চীনের তাত্ত্বিক ও আদর্শগত অবস্থান বদল, আগ্রাসী পুঁজিবাজারের অভ্যুদ্বয়ের পরও বাংলাদেশের মার্ক্সবাদী দলগুলো পুরনো অবস্থান থেকে সরে এসে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ দূর করতে সক্ষম হয়নি। কারণ এদেশে মার্ক্সবাদী দলগুলোর নেতৃত্বের দ্বন্দ্বই হলো সবচেয়ে বেশি প্রকট। তবে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ ক্ষেত্রে চার ধরনের সমস্যা

---

১ "With me (Marx), on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind, and translated into forms of thought." Karl Marx, Capital, Vol-1, Marx Engels Collected Works, Vol-35, Progress Publishers, Moscow, 1975, p. 19.

২ In particular, dialectics is the study of the opposition of the Thing-in-itself (an sich), of the essence, substratum, substance— from the appearance, from "Being- for-Others." V. I. Lenin; Philosophical Notebooks, Lenin Collected Works, Vol-38 Progress Publishers Moscow, 1 976; , P. 251.

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে (এ বিষয়ে ভিন্ন মত থাকতে পারে)। এই চারটি সমস্যা হলো–

প্রথমত, বাংলাদেশর আর্থসামাজিক অবস্থান পুঁজিবাদী, শাসক শ্রেণী হলো পুঁজিবাদের প্রতিনিধি, সমাজের অগ্রসরমান শ্রেণী হলো মধ্যবিত্ত এবং এই মধ্যবর্তি শ্রেণীই হলো বিপ্লবের সহায়ক। শিল্পকারখানার শ্রমিকরা বিপ্লবের অগ্রগামী অংশ এবং ছাত্র-কৃষক-বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের অনুগামী। এই বিপ্লবের স্তর যেমন সমাজতান্ত্রিক তেমনি বিপ্লবের পদ্ধতি হলো গণঅভ্যুত্থান। এই বিপ্লবী শ্রেণীর অবস্থান এদেশে এত বেশি দুর্বল যে এরা সমাজ রাজনীতিতে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় জাতীয় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ইস্যুভিত্তিক ঐক্য করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশের মার্ক্সবাদী দলগুলো নিজস্ব সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার লিখিত নীতি আদর্শ আঁকড়ে ধরার বদলে বুর্জোয়া দলগুলোকে 'জাতীয় বুর্জোয়া' মনে করে প্রধান প্রধান বুর্জোয়া দলের সাথে ক্ষমতার ভাগাভাগিতে ব্যস্ত। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশের মার্ক্সবাদী দলগুলো কার্যত তাদের নীতি আদর্শ আঁকড়ে ধরার বদলে বুর্জোয়া শাসনের কাছে অবনত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান হলো ঔপনিবেশিক এবং এদেশের শাসক শ্রেণী হলো ঔপনিবেশিক অনুচর, যার প্রধান শত্রু হলো সাম্রাজ্যবাদ ও তার আঞ্চলিক প্রতিনিধি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে পরাভূত করেই বিপ্লব সম্পন্ন হবে। এদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী দলগুলো মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অগ্রসর হলেও কার্যক্ষেত্রে সমাজের মধ্যবিত্ত বিলাসী শ্রেণী ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই বললেই চলে। সংগ্রাম, বিশ্ব রাজনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিশ্বায়ন বিরোধী ভূমিকা, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, নব্য আধুনিকতাবাদ, মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক অনুশীলন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এদেশে মার্ক্সবাদী দলগুলো তাদের কর্মকাণ্ডকে শহরকেন্দ্রিক করে রেখেছে। তাছাড়া এদেশের কোন কোন গ্রামাঞ্চলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের সুযোগ থাকলেও তা খুবই নগণ্য।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত ঃ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান আধা সামন্তবাদী ও আধা উপনিবেশবাদী। এদেশে পুঁজিবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি। এদেশের শাসকশ্রেণী সামন্তবাদী ভাবধারায় দেশ পরিচালনা করে। শিল্প শ্রমিকরা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান ভক্ত হলেও এদেশে শিল্প শ্রমিকের বদলে কৃষকরাই হলেন প্রধানতম শক্তি। শ্রেণী সংগঠনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে গণসংগঠনকে পুরোপুরি অস্বীকার করায় এদেশের শহরাঞ্চলে কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা নেই বললেই চলে। তারা গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হয়ে কাজ করে। কিন্তু লেনিনের 'বিপরীত সংঘাতই হলো বিকাশ' তত্ত্বকে তারা যান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করে একের পর এক দল ভেঙে নতুন দল গড়ে তোলে। এদের সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি গোপনীয় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তারা দল পরিচালনা করে। ফলে স্বীয় দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সরকারি নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী কৃর্তক গ্রেফতার ও নিহত হওয়ার পর এ ধরনের দলগুলো অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলীন।

এই সকল দল বা গ্রুপের শত শত রাজনৈতিক পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, কর্মপদ্ধতি, বর্তমান অবস্থান, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ, সাম্রাজ্যবাদী রণকৌশল, নতুন বাজার অর্থনীতির বিশ্লেষণ, কর্পোরেট আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট অনুধাবন, সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের আঞ্চলিক প্রতিনিধি ও সেই প্রতিনিধদের স্বার্থসংশ্লিষ্টতা, পুঁজি লগ্নি, লগ্নিপুঁজির পুনঃলগ্নিকরণ, জাতীয় বুর্জোয়া চরিত্র বিশ্লেষণ, শাসক শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ, বিশ্ব রাজনীতি, বিশ্ব অর্থনীতি, পুঁজির বিকাশ, শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা বদলের পদ্ধতি, তাদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার কৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন সম্পর্কের শ্রেণী-বিভাজন, উৎপাদন সম্পর্কের সাথে সামাজিক অপরাপর শ্রেণীসমূহের বৈপরীত্য, অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা, শিল্পের ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধতা, শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যহীনতা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোদুল্যমানতা, তরুণ সমাজের রাজনীতি বিমুখতা, পেটি বুর্জোয়া কর্তৃক সামাজিক ক্ষেত্রগুলোর দখল, মিডিয়ার দালালি, বিকৃত পুঁজি কর্তৃক মিডিয়া এবং সমাজের অগ্রসর অংশকে দখল করা, রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান, রাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশসমূহের শক্তিমত্তা ও তাদের সরকার পদ্ধতি, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুরদের রাজনৈতিক বিকাশসহ শত শত দিক বিবেচনা করে এ কথা বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক নয়, নয়া গণতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক। এই স্তরের বিপ্লবে বুর্জোয়া দলগুলোও সম্পৃক্ত হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার মতো শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব করার সুযোগ নেই। কারণ প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসেবে

বাংলাদেশের শ্রমিকরা গড়ে ওঠতে পারেনি। বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী শিল্প কারখানায় কাজ করে ঠিকই কিন্তু এই শ্রমিক শ্রেণীর সারা বছর শিল্প কারখানায় কাজ করে টাকা জমিয়ে একখণ্ড জমির মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই স্বপ্ন হয়তো বাস্তবায়নও সম্ভব হয়। একইসাথে এই শ্রমিকরা অনেকসময় একজন ক্ষুদ্র মালিকে পরিণত হয়ে যায়। কাজেই বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর চরিত্রে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। এ ধরনের সংকটপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও জটিল সমীকরণে বছরের পর বছর কালক্ষেপণ করে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের কাণ্ডারী বাম দলগুলোর অধিকাংশ নেতা-কর্মী হতাশ ও বিরক্ত হয়ে এই অবস্থা থেকে 'মুক্তির' উপায় হিসেবে বৃহৎ বুর্জোয়া দলগুলোর ছত্রছায়ায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে।

তাছাড়া বাংলাদেশে মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে ভাঙন ও ক্রমাগত বিভক্তির ফলে বহু নেতা ও কর্মী মধ্যপন্থি আওয়ামী লীগ এমনকি ডানপন্থি বিএনপি'তে যোগ দিতে দ্বিধা করেননি। এদেশে মার্ক্সবাদীদের মধ্যে যারা চীনাপন্থি ছিলেন এবং ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পরে তারা দলে দলে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের বিএনপিতে (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) যোগ দিয়ে নিজেদের অবস্থান একেবারে পাল্টে ফেলেছেন।

রাশিয়া ও চীনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের মহাবিতর্ক বা দ্বন্দ্বে উপমহাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রয়োগের ক্ষেত্র বাম রাজনীতিতে সর্বাধিক ভাঙন ধরে। বাংলাদেশেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রয়োগের ক্ষেত্র পরিচিত কমিউনিস্ট রাজনীতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বহুদল ও উপদলে বহুধাবিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এমনকি চীনাপন্থি কমিউনিস্ট রাজনীতিও মাওপন্থি, নকশালপন্থি, তোহাপন্থি ইত্যাদি দল, উপদল, সন্ত্রাসী সংগঠন (সিরাজ সিকদারের সর্বহারা দল) ইত্যাদি গড়ে উঠায় এদেশে কমিউনিস্ট রাজনীতি সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। মূলত ষাটের দশকে চীন–রাশিয়া মেরুকরণের সময় থেকে মাওলানা ভাসানীকে কেন্দ্র করে চীনাপন্থিরা একত্রিত হয়। আবার চীন ও পাকিস্তান ঘনিষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার কারণে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে ভাসানী সক্রিয় অবস্থান নিতে পারেন নি। অপরদিকে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক বির্তক বা দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় চীনাপন্থিরা কখনোই আওয়ামী লীগকে আস্থায় নিতে পারে নি। এই আস্থাহীনতার কারণেই সত্তর-এর দশকের পরে আওয়ামী লীগ ও পূর্ববাংলার চীনাপন্থি কমিউনিস্টদের মধ্যে পৃথক দূরত্বের সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার চেষ্টা করেন এবং এই চেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতিতে একটি নতুন দল গড়ে উঠে অথবা নতুন একটি ভগ্নাংশ তৈরি হয়। এটি মূলত সৃষ্ট হয়ে থাকে 'বিপরীতের সংঘাত' সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে অথবা 'বিপরীতের সংঘাত' না বোঝার ফলে। রাজনৈতিক দল হোক কিংবা রাষ্ট্রযন্ত্র হোক প্রতিটি ঘটনাই যে বস্তুজগতে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সামগ্রিকভাবে সুসংহত, যার মধ্যে বস্তুসমষ্টি ও ঘটনাগুলো পরস্পরের সাথে প্রকৃতিগতভাবে যুক্ত, তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন ঘটনাই যে পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে সক্ষম হন না। এই কারণে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভিন্ন ধরনের মতামত দেখা দিলে তারা তাকে 'উপদলীয় কোন্দল' বলেন। একইভাবে সমাজ জীবনে এই বিষয়টি তারা বুঝতে সক্ষম না হয়ে চিন্তা করেন যে, পরিস্থিতি বিকশিত হয়নি, কিংবা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার মত সময় আসেনি অথবা রাষ্ট্রের বিপক্ষে যাওয়ার মতো ক্ষমতা তারা অর্জন করেননি। তাইতো রাজনৈতিক দলের ভিন্ন মতামতের মীমাংসার ক্ষেত্রে সংগ্রাম বা তারা দুটি ভিন্ন মতামতের সংগ্রাম হিসেবে দেখতে পারেন না। এজন্যই রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপন্থার ভুল সংশোধন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণীর কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে। কারণ–

> প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই, বিপ্লবের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীর এনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার এছাড়া আর কোন পথ নেই। কেননা, বুর্জোয়ারা কখনোই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। আবার শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পরও বুর্জোয়ারা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের উচ্ছেদের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তাই বুর্জোয়াদের প্রতিরোধকে সবলে দাবিয়ে দেবার, তাদের সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য প্রয়োজন হয় বলপ্রয়োগের। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বেও চলতে থাকে শ্রেণীসংগ্রাম। সেজন্যই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব হচ্ছে প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামেরই যুক্তিসঙ্গত অনুবৃত্তি। কিন্তু যেহেতু বিজয়ের পর, শাসনক্ষমতা দখলের পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই শ্রেণী-সংগ্রাম পরিচালিত হয় সেহেতু শ্রেণী-সংগ্রামের রূপটাও পালটায়। বিপ্লবের পূর্বে যে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সেই শ্রেণী-সংগ্রাম বিপ্লবের পর নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রূপ ধারণ

> করে–শাসকশ্রেণীরূপে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব এই সংগ্রাম পরিচালনা করে; এই সংগ্রাম পরিচালিত হয় উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ও নতুন সমাজ গড়ে তোলার পথে সমস্ত প্রতিরোধকে সবলে দাবিয়ে দেয়ার জন্য। এই সংগ্রাম পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব যত বেশি সাফল্য অর্জন করবে ততই এই একনায়কত্বই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর অবসানের, সবরকম শ্রেণীবৈষম্য ঘুচিয়ে দেবার দিকে অগ্রসর হবে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর একায়কত্ব তার নিজের অবলুপ্তির দিকেই অগ্রসর হবে। যার থেকে প্রতিরোধের উৎপত্তি সেই শ্রেণীর ভিত্তিই যখন থাকবে না, তখন কোনরকম একনায়কত্বের প্রশ্নও থাকবে না। রাষ্ট্র তখন অন্তর্হিত হয়ে যাবে, বা শুকিয়ে যাবে।[১]

বাংলাদেশের মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক দলগুলো যে আদর্শ, যে লক্ষ্যে এবং যে পদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন নেতৃত্বের সমস্যার কারণে তা তারা করতে সক্ষম হননি। এই কারণেই বিরাজমান বিতর্ক বা দ্বন্দ্বগুলো তারা চাপা দিয়ে রাখতে চান। যে পক্ষ এই বিরাজমান বিতর্ক বা দ্বন্দ্বগুলো চাপা রাখতে চান না তারা নিজেদের মতামতের মূল্যায়ন করা হলো না বা তাদের মতামত জয়লাভ করলো না ভেবে একপর্যায়ে মূল দল থেকে বের হয়ে নতুন একটি দল গঠন করে। এই ধারা চলে আসছে বছরের পর বছর। কখনো মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নতুন দলগুলো নিজেদের ভেতরের সমস্যাগুলো পুষে রেখে নামেমাত্র ঐক্যের সুর তুলে ঐক্যবদ্ধ হতে চান বা হনও। কিন্তু কিছুদিন পর আগের মতোই ভাঙন এসে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক দলই (কমিউনিস্ট পার্টি) করবে এমন নয়। এই বিপ্লবে সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর (কমিউনিস্ট পার্টি) সাথে যেমন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও থাকতে পারে, তেমনি থাকতে পারে বুর্জোয়া ধারার কিছু কিছু দল–যারা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যবাদের চেতনা থেকে মুক্ত মনে করেন। যেমন, ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (রুশ বিপ্লব) সময় এ ধরনের শত শত

[১] সুধাংশু দাশগুপ্ত; *রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি*; নিশান প্রকাশনী; কলিকাতা; ২০১১; পৃ. ৬১-৬২।

দল ছিল। কিন্তু বিপ্লবের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিল বলশেভিক[১] (Bolsheviks) ও মেনশেভিকরা (Mensheviks)। পরবর্তীতে অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখে বলশেভিকরা (Bolsheviks) পুরোপুরিভাবে ক্ষমতা দখল করে। আবার চীনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, মাও সেতুং (Mao Zedong)-এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ('*Communist Party of China*') সহযোগী হিসেবে প্রায় আশিটির মত দল ছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সানইয়াৎ সেন-এর গণতান্ত্রিক দল। জাপ বিরোধী যুদ্ধের[২] সময় এই জাতীয়তাবাদী দলটি ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল মাও সেতুং-এর নেতৃত্বাধীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। জাতীয় বুর্জোয়া বা জাতীয়তাবাদী দলগুলো এই কেন্দ্রিকতা মানতে বাধ্য ছিল। কারণ তারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকেই যোগ্যতম দল হিসেবে বিবেচনা করেছিল। সেসময় সমগ্র চীনকে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ছিল। ১৯৪৫ সালের ২৩ এপ্রিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগেসের অধিবেশনে মাও সেতুং তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে বলেন,

---

১ রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দুটি অংশ হলো বলশেভিক ও মেনশেভিক। লেনিনের (Vladimir Lenin) নেতৃত্বে ছিল বলশেভিকরা আর জুলিয়াস মার্তভের (Julius Martov) নেতৃত্বের ছিল মেনশেভিকরা। বলশেভিক (Bolsheviks) হলো মার্ক্সবাদী রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রিটিক লেবার পার্টির একটি উপদল, যা ১৯০৩ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এর অন্য একটি উপদল মেনশেভিক থেকে পৃথক হয়ে যায়। একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ফলে তাদের নাম হয় বলশেভিক (Bolsheviks)। পরবর্তীতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তারা ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকালীন অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক (Russian Soviet Federative Socialist Republic) পত্তন করে যা পরবর্তীকালে ১৯২২ সালে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লেনিন (V. I. Lenin) এবং আলেকজান্ডার বগদানভ (Alexander Bogdanov) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক (Bolsheviks) ১৯০৫ সাল পর্যন্ত একটি গণসংগঠনে পরিণত হয় যার সদস্য মূলত ছিল অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পদবিন্যাসে সংগঠিত শ্রমিক জনগোষ্ঠী যা কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হতো। তারা নিজেদেরকে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসেকে বিবেচনা করতো। তাদের বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডকে বলশেভিকবাদ (Bolshevism) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

২ ১৯৩৫ সালে সাম্রাজ্যবাদী জাপান উত্তর চীন নতুন করে আক্রমণ করে। চীন দখলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও জাপানের মধ্যে সংগ্রাম জোরদার হয়। ১৯৩৫ সালের ৯ ও ১৬ ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্ররা জাপ-প্রতিরোধ ও চীন বাঁচাও আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃষক শ্রমিকের সংগে যোগাযোগ করে। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের কৌশল গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৫ সালের শেষে গৃহযুদ্ধের প্রায় সমাপ্তি ঘটে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়।

"আমাদের কর্মনীতির মূলকথাই হচ্ছে নির্ভীকভাবে জনগণকে সমবেত করা, জনগণের শক্তিগুলোকে সম্প্রসারিত করা যাতে করে আমাদের পার্টির নেতৃত্বাধীনে তারা আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারবে এং নতুন একটি চিন গড়ে তুলবে।"[১]

৩.৩ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের স্তর ও শ্রেণীসমূহের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ বা দ্বন্দ্ব

বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার পর বিশেষ করে রাশিয়ার বলশেভিক (Bolsheviks) বিপ্লবের পর মার্ক্সের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদেরও গুণগত পরিবর্তন এসেছে। নতুন বিশ্ব পরিস্থিততে দ্বন্দ্বের বিকাশ এবং দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে চীনের সম্পন্ন হলে বিশ্ব পুঁজিবাদ, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর শত্রু-মিত্র, কৃষি সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদের হুমকি ইত্যাদি বিষয়গুলো সামনে চলে আসায় দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা ও সারসংকলন করতে হয়েছে। যেমন, চীনের বিপ্লবের সময়ে মাও সেতুং 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'কে দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি 'দ্বন্দ্বে সার্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা, প্রধান দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে বৈরিতা ও অভেদ'-এই বিষয়গুলোকে দ্বন্দ্বের নতুন ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন। তিনি এই বিষয়গুলোকে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আবিষ্কার করেন এবং বিপ্লবী প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বার্থক বাস্তবায়ন ঘটান।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্ব পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়ায় বিশেষ করে রাশিয়ায় বলশেভিক (Bolsheviks) বিপ্লবের পর মার্ক্স-এর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেরও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে দ্বন্দ্বের বিকাশ এবং দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। পরবর্তীতে চীনের বিপ্লব সম্পন্ন হলে বিশ্ব পুঁজিবাদ, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু-মিত্র, কৃষি সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদের হুমকি ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্মুখে আসায় দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। যেমন, চীন বিপ্লবের সময়ে মাও সেতুং এই নতুন চিন্তা-ভাবনার নতুন সারসংকলন করেছেন এবং 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'কে দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন, চীনের বিপ্লবের সময়ে মাও সেতুং 'দ্বন্দ্বের নিয়ম'কে দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি 'দ্বন্দ্বে সার্বজনীনতা ও বিশিষ্টতা, প্রধান দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে বৈরিতা ও অভেদ'-এই বিষয়গুলোকে দ্বন্দ্বের নতুন ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন। তিনি এই বিষয়গুলোকে বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের

[১] মাও সেতুং, *নির্বাচিত রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৯১।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আবিষ্কার করেন এবং বিপ্লবী প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বার্থক বাস্তবায়ন ঘটান। মার্ক্সীয় জ্ঞানতত্ত্বকে তিনি সমৃদ্ধ করেন – সকল জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে অনুশীলনকে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে। অর্থাৎ, তিনি জ্ঞানের দ্বন্দ্ববাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বস্তু ও চেতনার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। বাস্তব বিপ্লবী সংগ্রাম ও শ্রেণী-সংগ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি এ বিষয়টি আবিষ্কার করেন এবং বিপ্লবী অনুশীলনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো 'স্বাধীন' রাষ্ট্র বলা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন কৌশলে সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ অর্থনৈতিকভাবে বর্তমানে কোন রাষ্ট স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। এজন্যই জাতীয় বুর্জোয়ার সাথে সাম্রাজ্যবাদের, শাসক শ্রেণীর সঙ্গে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর, শাসক শ্রেণীর একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এসব দ্বন্দ্বের সঙ্গে রয়েছে গ্রামীণ ধনী কৃষকের সঙ্গে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র কৃষকের সঙ্গে জোতদারের দ্বন্দ্ব, গ্রাম্য জোতদার–ভূমিমালিকদের সঙ্গে শহুরে শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, পুঁজিবাদীদের সঙ্গে স্থায়ী–সাময়িক শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব, কৃষিনির্ভর শ্রেণীর সঙ্গে শহুরে ব্যবসায়ী শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে নেতৃত্বদানকারী বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে অশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং ভাসমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষুদ্র মালিকদের দ্বন্দ্ব। এই সকল দ্বন্দ্বের মীমাংসার ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান দ্বন্দ্ব হলো ব্যাপকভাবে অবহেলিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রধান দিক হলো– যেহেতু শাসক শ্রেণী দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর একাংশের প্রতিনিধিত্ব করে এবং শাসকশ্রেণীর দু'টি বা তিনটি রাজনৈতিক দল সেই প্রতিনিধি সেহেতু শাসকশ্রেণীর বাইরের বিশাল জনগোষ্ঠীর মুক্তিই আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত। একামাত্র ব্যাপক সহিংস বিপ্লবই এই জনগোষ্ঠীকে মুক্তি দিতে পারে।

বাংলাদেশে রাষ্ট্র নিজেই হলো শক্তি প্রয়োগের একটি রূপ। রাষ্ট্রযন্ত্রের মূল উৎপাদনই হলো সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিভিন্ন আধা-সামরিক বাহিনী। বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, নিজেদের শাসন রক্ষা করার জন্য সমস্ত শাসকশ্রেণীই শক্তি প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। মার্ক্সবাদের শিক্ষা অনুসারে, প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণী অবশ্যই শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা দখলের পথই পছন্দ করে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলো কখনোই স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে না। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ক্ষমতার প্রশ্নে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে একমাত্র দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদের মৌলিক

শিক্ষা অনুসারে, প্রতিটি বিপ্লবের মূল প্রশ্নই হলো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন। তাইতো প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মূল প্রশ্ন হলো শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর একনায়কত্ব কায়েম করা এবং প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্র দ্বারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্তকরণ। এ প্রসঙ্গে V. I. Lenin তাঁর '*Prophetic Words*' রচনায় বলেন, "... civil war, without which not one of the great revolutions of history has taken place, and without which not a single serious Marxist has conceived the transition from capitalism to socialism."[১] একইভাবে Mao Tse-Tung তাঁর '*On Contradiction*' রচনায় বলেন, "শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য আর এগুলো ছাড়া সমাজ বিকাশের কোন অগ্রগতি সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীগুলোকে উচ্ছেদ করা অসম্ভব।"[২]

৩.৪ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে প্রয়োগে সুপারিশসমূহ

ঐতিহাসিক বিপ্লবের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই সমাজতন্ত্র এমনিতেই আসে না। বিপ্লবের মাধ্যমে একটি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলো বুর্জোয়া তথা পুঁজিপতি শ্রেণীকে রাষ্ট্র ও সমাজের কর্তৃত্ব থেকে উৎখাত করে প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর এই উৎখাতের কাজটি করতে হবে রাষ্ট্র এবং সমাজের সর্বস্তরে এবং সর্বতোভাবে। তাইতো বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরত্ব দেয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

---

১ Lenin; *Collected Works;* volume-27; Progress Publishers; Moscow; 1974; P. 496.

২ "It enables us to understand that revolutions and revolutionary wars are inevitable in class society and that without them, it is impossible to accomplish any leap in social development and to overthrow the reactionary ruling classes and therefore impossible for the people to win political power." Mao Tse-Tung, *Selected Works;* Volume I; Foreign Languages Press, Peking, 1965; P. 344.

Dhaka University Institutional Repository

১। বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ ও বিকাশের জন্য অগ্রগামী বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। মাতৃভাষা সহ বিশ্বের অন্যান্য ভাষাও তাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস, সমগ্র বিশ্বের শিল্প-সাহিত্য-সংগীত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অতীত ও বর্তমান ধারা ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে হবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রমিকদের স্থান নেই তার বিপরীতে শ্রমিকদের জন্য জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।

২। বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীকে সবসময়ই তার মনুষ্য পরিচয় বজায় রাখতে হবে। কারণ মানুষ শ্রমের কারণেই মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই প্রতিটি মানুষ মানেই হলো শ্রমিক এবং প্রতিটি শ্রমিক মানেই হলো মানুষ। এজন্য পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি অখণ্ড সত্তা মনে করতে হবে এবং নিজেদেরকে সমগ্র মানবজাতির অংশ মনে করে পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সাথে একাত্ম হয়ে তাদের সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৩। নিজ দেশের পুঁজিবাদকে পরাস্ত করতে বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী জোট ও কর্ম-তৎপরতার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর সাথে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এই ঐক্যের ভিত্তিতে আগামী দিনের যে কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব সংগঠন গড়ে তুলে বিশ্বশান্তির সপক্ষে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে এম এম আকাশ বলেন,

> পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আশু "দীপ্তি" দেখে কমিউনিস্টদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যেকোন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী শোষিত জনগণ যতদিন আছেন ততদিন তাঁদের উদ্বৃত্ত মূল্য চুরির ব্যাপারটি থাকবে। ...যতদিন শোষণ ও অন্যায় থাকবে ততদিন তার বিরুদ্ধে শোষিতদের ন্যায়ের সংগ্রাম চলতে থাকবে। ততদিন কমিউনিজমের ও কমিউনিস্টদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সামাজিক বাস্তব ভিত্তি থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে–এই কঠিন সংগ্রামে সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে শামিল হবে, না কি একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধিকেই জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে শ্রমজীবি শোষিতরাই এই কঠিন পথের প্রধান যাত্রী হবেন। কমিউনিস্টদের তাই স্বাভাবিক সমর্থন ভিত্তি হবে "শ্রমজীবী শোষিত জনগণ"। অন্য শ্রেণীর লোক, যে পরিমাণ যৌথ স্বার্থের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন সে

Dhaka University Institutional Repository

> পরিমাণে তাঁরা হবেন কমিউনিস্টদের সহযাত্রী, মিত্র বা সহানুভূতিশীল সমর্থক। সকল বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের আজ ঠিক করতে হবে, তারা কি তাদের পুরাতন ঐতিহাসিক প্রকল্পের ভুল-ভ্রান্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, শৌর্য-বীর্য, হাসি-কান্নায় ভরপুর অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করবেন এবং পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, না কি পুরনো ঐতিহ্যকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যাবেন। ... "অতীতের সবকিছুই ভুল"-এ রকম নৈরাজ্যবাদী নীতির চূড়ান্ত পরিণতি হবে বিলুপ্তি। এই ধরনের পথে বিলুপ্তি হবে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পচনের মাধ্যমে বিলুপ্তি। আবার "অতীতের সবকিছুই ঠিক"-এই দ্বিতীয় পথের পরিণতি হবে বিলুপ্তি। এই পথে বিলুপ্তি আসবে ধীরে-ধীরে, প্রথমে মৃত্যু এবং পরে মমি বা ফসিলে পরিণত হয়ে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ও আশা করি বামপন্থী ও কমিউনিষ্টরা বিলুপ্তি হবেন না, বরং সৃজনশীলভাবে বিকশিত, নবায়িত ও পুনর্জাগরিত হবেন।[১]

৪। বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে কিছু কিছু ছাত্র-শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক, লেখক-সাংবাদিক ও পেশাজীবী-বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক শ্রেণীর আকর্ষণে এগিয়ে আসতে চায়, নেতৃত্ব দিতে চায়। কিন্তু বোধ-বুদ্ধিতে, আবেগ-আচরণে স্বীয় শ্রেণী ত্যাগ করে দীর্ঘকালীন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁদেরকে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে একাত্ম হতে হবে এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫। বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত মার্ক্সবাদী দলগুলোর অধীনে প্রতিটি শিল্প কারখানায়, প্রতিটি অঞ্চলে ও প্রতিটি জেলায় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই সকল সংগঠনকে সব ধরনের শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী বোধ-বুদ্ধি-আবেগ-আচরণ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

৬। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর পক্ষে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণীকেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। কারণ একমাত্র প্রলেতারিয়েত বা শ্রমিকশ্রেণী হলো সেই শ্রেণী, যার শৃঙ্খল ব্যতীত হারাবার মতো কিছুই নেই, কিন্তু জয় করার মতো রয়েছে সমগ্র দেশ-সমগ্র বিশ্ব। তাইতো বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্য শ্রমিকশ্রেণীকেই নেতৃত্ব দিতে হবে।

---

[১] এম এম আকাশ; *একবিংশ শতকে পুঁজি: মার্কস থেকে পিকেটী;* বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেসন, ঢাকা, ২০১৫; পৃ. ১৩-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারণা যাত্রা শুরু করে। সেই সময় এ দেশে (তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান) মস্কোপন্থি ও পিকিংপন্থ ঐতিহাসিক বস্তুবাদী রাজনীতি শুরু হয়। যার প্রতিফলন আমাদের আজকের স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতীয়মান। বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনরূপ এবং জনগণের সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় যারা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করছেন তারা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগিক জ্ঞানে যে কতটা পিছিয়ে আছেন তথা কতটা অনভিজ্ঞ তা সহজেই অনুমেয়। বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের স্তর এবং শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েতের ব্যাপকতম অংশের সচেতনতা ও সংগঠনশীলতার মাত্রা অনুসারে বাংলাদেশে কোন বিপ্লবী পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেনি। অর্থাৎ, বাংলাদেশে সংগতিনিষ্ঠ একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রক্রিয়া একেবারেই ভ্রূণাবস্থায়। এতে করে প্রলেতারিয়েতের পরিপূর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। তাছাড়া শ্রমিকশ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর মুক্তি অর্জন কেবলমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব। মেহনতি জনগণের সচেতনতা ও সংগঠনশীলতা ব্যতীত, বিশাল সংখ্যাধিকের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাধিকের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন ব্যতীত, সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য শ্রমিক শ্রেণী তথা প্রলেতারিয়েতের শিক্ষালাভ ও প্রস্তুতি ব্যতীত বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা উঠতেই পারে না। বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্য প্রযোজন হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালিত হতে হবে। বিপ্লবের জয় কখনো আপনা থেকে আসে না। বিপ্লবকে জয় করে আনতে হয়। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিশালী ও সুদক্ষ বিপ্লবী পার্টি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বিপ্লবকে সফল করতে পারে। বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য বিপ্লবী পরিস্থিতিকে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করার মতো সুদক্ষ ও সুসংগঠিত বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলতে হবে। তাইতো এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্বও শ্রমিকশ্রেণীকে গ্রহণ করতে হবে। মার্ক্স বলেন, "শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি

শ্রমিকশ্রেণীকেই জয় করে নিতে হবে; শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম, তার অর্থ শ্রেণীগত সুবিধা ও একচেটিয়া অধিকারের জন্য সংগ্রাম নয়, সমান অধিকার ও কর্তব্যের জন্য এবং সমস্ত শ্রেণী আধিপত্যের উচ্ছেদের জন্য।"[১] আর গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী যাতে অন্যান্য শ্রেণী ও পার্টিগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা না করে তবে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে শ্রমিকশ্রেণী সফলতা অর্জন করতে পারবে না। ঐক্যবদ্ধ কাজের জন্য এ ধরনের বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যাপারে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির স্বাধীনতা ও নিজস্ব ভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। যেমন, রাশিয়ার জারতন্ত্র পতনের পূর্বে রাশিয়ার বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা (Russian revolutionary Social-Democrats) বার বার উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের ব্যবহার করেছে। এমনকি ১৯০১-০২ সালে বলশেভিকবাদের আবির্ভাবের আগেও প্লেখানভ (Plekhanov), এক্সেলরড (Axelrod), জালুলিচ (Zasulich), মার্তভ (Martov), পাত্রেসভ (Potresov) ও লেনিনকে (V. I. Lenin) নিয়ে গঠিত 'ইস্ক্রার (*Iskra*) সম্পাদকমণ্ডলী বুর্জোয়া রাজনৈতিক নেতা স্টুভের (Struve) সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু একইসঙ্গে তাঁরা সকল সময়ই বুর্জোয়া রাজনৈতিক উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে আদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯০৫ সাল থেকে তাঁরা উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষক একতাকে ক্রমাগত সমর্থন করেছেন।[২] আবার ঐক্যবদ্ধ কাজ ও জোট বাঁধার কৌশল বলশেভিকরা রুশ বিপ্লবে প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন, অক্টোবর বিপ্লবের মুহূর্তেও সমাজ বিপ্লবীদের (*Socialist-*

---

[১] That the emancipation of the working classes must be conquered by the working classes themselves; that the struggle for the emancipation of the working classes means not a struggle for class privileges and monopolies, but for equal rights and duties, and the abolition of all class rule. Karl Marx and Fredrick Engels Collected Works, Volume 21, Progress Publishers, Moscow, 1969, p.332

[২] ... the Russian revolutionary Social-Democrats made repeated use of the services of the bourgeois liberals, i.e., they concluded numerous practical compromises with the latter....a formal political alliance with Struve, the political leader of bourgeois liberalism, while at the same time being able to wage an unremitting and most merciless ideological and political struggle against bourgeois liberalism and against the slightest manifestation of its influence in the working-class movement. বিস্তারিত দেখুন, V. I. Lenin; *"Left-Wing" Communism—An Infantile Disorder;* Collected Works; VOL. 31; Progress Publishers; Moscow; 1974; pp. 71-72.

Revolutionary) কৃষি কর্মপন্থা বিন্দুমাত্র রদবদল না করে পুরোপুরি গ্রহণ করে প্লেখানভ, এক্সেলরড, জালুলিচ, মার্তভ, পাত্রেসভ ও লেনিন পেটি-বুর্জোয়া কৃষকদের সঙ্গে বেসরকারিভাবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত রাজনৈতিক জোট গঠন করেছিলেন।[১] একইভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পার্টি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক রাজনৈতিক পার্টি বা শ্রমজীবীদের পার্টিতে পরিণত হয়েছিল। এই পার্টি সচেতনভাবে চীনা জনগণের স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল এবং চীনের বিশেষ অবস্থায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগের ভিতর দিয়ে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শের দৃঢ়ভিত্তির উপরে নিজেকে গড়ে তুলেছিল। কমরেড মাও সেতুং-এর চিন্তাধারা চীন বিপ্লবের নিজস্ব কর্মপন্থায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সমন্বয় সাধন করেছিল। তাঁর এই চিন্তাধারাকে পথ নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে যে বিপ্লবী কর্মসূচি ও বিপ্লবনীতি গড়ে তুলেছিল তার মধ্যে চীনা জাতি ও চীনা জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাইতো বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের যথার্থ প্রয়োগের জন্য তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য, গণসংগ্রামকে সার্থক করার জন্য, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বিজয়ী করার জন্য এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও মাও সেতুং-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করতে হবে। এই শিক্ষার মূলকথা হলো বিপ্লবের নির্দিষ্ট স্তরে একই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যান্য শ্রেণী, পার্টি ও সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম চালানোর প্রচেষ্টা করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী ও কমিউনিস্ট সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সূত্রপাত হলেও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির বয়স হলো একটি শিশুর সমান। এজন্যই কোন বিচক্ষণ রাজনীতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়নি। এদেশের কোন কমিউনিস্ট পার্টি আজ পর্যন্ত তাদের গঠনতন্ত্র থেকে শুরু করে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। অর্থাৎ, মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির আলোকে সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায়

---

[১] At the very moment of the October Revolution, we entered into an informal but very important political bloc with the petty-bourgeois peasantry by adopting the *Socialist-Revolutionary* agrarian programme *in its entirety*, without a single alteration—i.e., we effected an undeniable compromise in order to prove to the peasants that we wanted, not to "steam-roller" them but to reach agreement with them. বিস্তারিত দেখুন, *Ibid,* pp. 72.

বাংলাদেশের মার্ক্সবাদী দলগুলো এখন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। আজকে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রায় সামগ্রিকভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষণীয় এবং এদের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত হলেও এদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যথার্থ অর্থপূর্ণ হতে পারেনি। কারণ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের জন্য সঠিক নেতৃত্ব, মার্ক্সীয় রাজনীতির সঠিক অনুধাবন ও সঠিক জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বাস্তব অবস্থা বিরাজমান থাকলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগে এদেশে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অপরিণত, অপরিপক্ক ও দুর্বল। তবে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ ও প্রসার পুরোপুরিভাবে না হলেও, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগের কর্মপন্থায় বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এদেশের গণ-আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনে এর ভূমিকা অগ্রগণ্য। সংস্কারবদ্ধ এদেশের গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না, বোঝে না, মানে না। এই মানুষগুলোর মধ্যে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মর্মকথা সম্পর্কে সঠিক, সুস্পষ্ট ও প্রয়োগমূলক দিকনির্দেশনা সরবরাহ করতে হবে। কারণ সমাজ পরিবর্তনে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিকল্প এখনো অজ্ঞাত। তাইতো বাংলাদেশের মেহনতি জনগণের মুক্তির জন্য তথা অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা কাটিয়ে কৃষি ও শিল্পভিত্তিক একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য এবং কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে বিপ্লবের মাধ্যমে যেরূপ রাষ্ট্রীয় কাঠামো দরকার তা হলো প্রলেতারিয়েত ও তার পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকসহ শ্রমজীবী জনগণ এবং সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। কারণ এদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হবে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল কৃষিপ্রধান পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর তথা কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ধরনের কর্তব্যই পালন করতে হবে। অর্থাৎ, এখানে বিদেশি সরকার ও পুঁজিপতিদের দালাল-আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র ও ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম হবে গণতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম হবে সমাজতান্ত্রিক। তাহলেই আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের গণতন্ত্রের জায়গায় বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে জনগণের

গণতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রজাতন্ত্রের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে জনগণের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। আর এরই অগ্রপদক্ষেপে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। কারণ বাংলাদেশে যদি কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করে তাহলে এদেশে ধর্মীয় ক্রোন্দল, আর্থসামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটবে। তাছাড়া শুধু বাংলাদেশের জন্যই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রয়োগ তথা মার্ক্সবাদ কামনা করা ঠিক হবে না। যেহেতু দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে নেপাল, ভুটান, ভারত, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের মানুষগুলোও বাংলাদেশের মানুষের মানুষের মতো আলো বাতাস ভোগ করে, জীবনযাপন করে, বেঁচে থাকে সেহেতু তাদের ভবিষ্যতের উন্নতি ও উন্নয়নের জন্য শ্রমিকশ্রেণী বা প্রলেতারিয়েত মিশন বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তথা মার্ক্সবাদ-এর অগ্রযাত্রার বাস্তবায়ন একটি বিশাল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

মূল গ্রন্থপঞ্জি (ইংরেজী)

1. Marx, Karl and Engels, Fredrick, Selected Works, Volume One, (Moscow : Progress Publishers, 1969).
2. ————————, Selected Works, Volume Three, (Moscow : Progress Publishers, 1970).
3. ————————, Collected Works, Volume 5, (New York: International Publishers, 1975).
4. ————————, Collected Works, Volume 5, (Moscow : Progress Publishers, 1976).

   ————————, Collected Works, Volume 35 (New York: International Publishers, 1996).
5. ————————, Collected Works, Vol-1, (Moscow : Progress Publishers, 1975).
6. ————————, Collected Works, Volume 5, (New York : International Publishers, 1975).
7. ————————, *Collected-Works,* volume-6, (Moscow : Progress Publishers, 1980).
8. ————————, Collected Works, Vol-35, (New York : International Publishers, 1996).
9. ————————, Collected Works, Volume 26, (Moscow : Progress Publishers, 1980).
10. ————————, Collected Works, Volume 37, (Moscow : Progress Publishers, 1980).
11. ————————, Collected Works, Volume 11, (Moscow : Progress

Publishers, 1976).

12. ————————, Collected Works, Volume 6, (Moscow : Progress Publishers, 1980).
13. ————————, Collected Works, Volume 39, (Moscow : Progress Publishers, 1980).
14. Marx, Karl, *A Contribution to the Critique of the Political Economy,* (New Delhi :People's Publishing House (P) Ltd, 2010).
15. ————————, *Capital*, Volume One, Afterword to the Second German Edition, (New York · London : W.W. Norton & Company, 1978)
16. ————————, *Contribution to the Critique of Hegels Philosophy of Right: Introduction, The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker (Princeton University), (New York · London: W.W. Norton & Company, 1978).
17. ————————, *Capital : A Critique of Political Economy,* Vol. 1, (Moscow : Progress Publishers, 1954).
18. ————————, *A Contribution to the Critique of Political Economy*, (Moscow : Progress Publishers, 1977).
19. Engels, Frederick, *Anti-Dühring*, (Peking : Foreign Language Press, 1976)
20. Marx and Engels, *The Holy Family, or Critique of Critical Criticism. Against Bruno Bauer and Company,* Translated by Richard Dixon and Clemens Dutt, (Moscow : Progress Publishers, 1980).

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরেজী)

1. Marx Engels Lenin, *On Historical Materialism: A Collection*, Compiled by Borodulina, (Moscow : Progress Publishers, 1972).

2. Hegel, G.W.F., *Reading Hegel the introduction,* Edited and Introduced by Aakash Singh and Rimina Mohapatra, (Melbourne, Australia, 2008).
3. Stalin, J. V., *Dialectical and Historical Materialism, Selected Works (vol-1)*, (Kolkata : Prometheus Publishing House, 2012).
4. *The Marx-Engels Reader,* (Second Edition) Edited by Robert C. Tucker, Princeton University, (New York · London : W.W. Norton & Company, 1978).
5. Lenin, V. I., Collected works, Volume 31, (Moscow : Progress Publishers, 1974).
6. ————————, Collected works, Volume *29*, (Moscow : Progress Publishers, 1974).
7. ————————, Philosophical Notebooks, Lenin Collected Works, Vol-38, (Moscow : Progress Publishers, 1 976).
8. ————————, Collected Works, VOL. 31, (Moscow : Progress Publishers, 1974).
9. ————————, *On the Socialist Transformation of Agriculture,* (Moscow : Novosti Press Agency Publishing House, 1973).
10. Tse-Tung, Mao, *Selected Works,* Volume I, (Peking : Foreign Languages Press, 1965).
11. T. Borodulina (Complited), K. Marx F. Engels V. Lenin, *On Historical Materialism : A Collection,* (Moscow : Progress Publishers, 1972).
12 V.Kelle and M.Kovalson, *Historical Materialism : An Outline of Marxist Theory of Society,* (Moscow : Progress Publishers, 1973).

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি (বাংলা)

১. ইমাম, পারভেজ, *হেগেল : জীবন ও দর্শন*, (কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৭).

২. স্তেপানভা, য়েভগেনিয়া, *কার্ল মার্কস*, অনুবাদঃ অরুণ সোম, সম্পাদনাঃ সুবীর মজুমদার, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬).

৩. হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, (ঢাকা : পড়ুয়া, ১৯৯৭).

৪. আবদৌন, জয়নাল, *উপমহাদেশের জাতীয়তাবাদী ও বামধারার রাজনীতি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : বাংলা প্রকাশ, ২০১৩).

৫. *ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী) রাজনৈতিক প্রস্তাব সপ্তম–অষ্টাদশ কংগ্রেস*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮).

৬. *বাংলাপিডিয়া বংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খণ্ড ৬, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩).

৭. মুকুল, এম আর আখতার, *আমি বিজয় দেখেছি* (ঢাকা : অনন্যা, ২০১৪).

৮. রহমান, ড. মো. মাহবুবর, বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯৪৭–৭১, (ঢাকা : সময় প্রকাশন, ২০০৬).

৯. রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদক), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ* পঞ্চদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০০৯).

১০. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*

১১. ইলিয়াস, খোন্দকার মোহাম্মদ, *মুজিববাদ*, (ঢাকা : ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ১৯৭২).

১২. দাশগুপ্ত, সুধাংশু, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি*,(কলিকাতা : নিশান প্রকাশনী, ২০১১).

১৩. সেতুং, মাও, *নির্বাচিত রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ২০০১).

১৪. প্লেখানভ, গেওর্গি, *ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা*, ভাষান্তরঃ বিশ্বনাথ সাহা, (কলকাতা : দীপায়ন, ২০০৮).

১৫. স্তালিন, জে ভি, *দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১).

১৬. বার্নস, এমিল, *মার্কসবাদ*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭).

১৭. আকাশ, এম এম, *একবিংশ শতকে পুঁজি: মার্কস থেকে পিকেটী*, (ঢাকা: বাঙলার পাঠশালা ফাউন্ডেসন, ২০১৫).

১৮. লেনিন, ভি. আই, *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০).

১৯. কার্ল মার্কস ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, *কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তিহার*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪).

২০. ————————, *রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ*, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭১).

২১. ————————, *রচনা সংকলন, রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ*, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২).

২৩. ————————, *রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ*, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২).

২৪. ————————, *রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০).

২৫. মার্কস, কার্ল, *পুঁজি*, খণ্ড ১, অংশ ১, সম্পাদনাঃ প্রফুল্ল রায়, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮).

২৬. ————————, *পুঁজি*, খণ্ড ১, অংশ ২, সম্পাদনাঃ প্রফুল্ল রায়, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)

২৭. ————————, *পুঁজি*, খণ্ড ৩, সম্পাদনাঃ প্রফুল্ল রায়, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮).

২৮. লিউ শাও-কি, *কমিউনিস্ট পার্টি প্রসঙ্গে*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০).

২৯. উমর, বদরুদ্দীন, *মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, (কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, , ২০০৮).

৩০. মুখোপাধ্যায়, সরোজ, *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, প্রথম খণ্ড (১৯৩০-৪১), (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৩).

৩১. সেন, সুকোমল, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-২০০০*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৭).

৩২. দাশগুপ্ত, সুধাংশু, *শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকাশক্তি*, (কলকাতা : নিশান প্রকাশনী, ২০০৩).

৩৩. আহ্‌মদ, মুজফ্‌ফর, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১১).

৩৪. ————————, *ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯).

৩৫. ————————, *সমকালের কথা*, (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৪).

৩৬. আজাদ, আলাউদ্দিন আল, *মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ*, (ঢাকা : বংলা একাডেমী, ১৯৯০).

পত্রিকা

১. খান, নূরুর রহমান (সম্পাদক), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৬৯, (ঢাকা : ফেব্রুয়ারি, ২০০১).

২. বসু, বিমান (সম্পাদনা), *মার্কসবাদী পথ , বর্ষ ৩০, সংখ্যা ১*, (কলকাতা : গণশক্তি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০).

৩. ————————, *মার্কসবাদী পথ , বর্ষ ৩২, সংখ্যা ১*, (কলকাতা : গণশক্তি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২).